দূরবীনের উল্টো দিকে

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৩৫৭

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিণ্টার্স
১৩৮, বিধান সরণী
কলকাতা-৪

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

প্রফুল্ল রায়

পরম সুহৃদবরেষু

আজ রবিবার। তেসরা এপ্রিল। সাল বলার দরকার নেই।

এখন বেলা দশটা বেজে দশ। লিভিং রুমে ওয়াল ক্লকে সেকেণ্ডের কাঁটাটা ওভারটাইম খাটছিল। উনচল্লিশ বছর বয়সের তাজা হাইকোর্ট জজ শরদিন্দু ঘোষাল গরম জলের টবে বাঁ পায়ের গোড়ালি ডুবিয়ে নিজের বাড়ির দেওয়ালে একখানা গ্রুপ ফোটো থেকে নিজেকে চেনবার চেষ্টা করছিলেন।

ওই ছবিতে আমি একত্রিশ বছরের একজন সাবজজ। বাঁকুড়া কোর্ট ময়দানে অফিস থেকে আমার ফেয়ারওয়েলের ছবি। ওখানে থাকতে আমি বড় জোর সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছি!

তারপর পুরুলিয়ায় ডিস্ট্রিক্ট অ্যাণ্ড সেসন জজ। ওখানে—ওখানে থাকতেই আমি প্রথম ফাঁসির আদেশ দিয়েছি। ডাকাতির কেস। সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা মাথায় খুন। মহামান্য হাইকোর্ট আমার সে আদেশ বহাল রেখেছিলেন। সেখান থেকে ব্যাপারটা সুপ্রীম কোর্টে গেল। তারপর রাষ্ট্রপতি অব্দি গড়িয়েছিল। প্রেসিডেণ্টের করুণা ভিক্ষা।

নুন দেবো?

শরদিন্দু চমকে তাকালেন, দাও। ক'দিনই হাঁটতে গিয়ে পায়ে লাগছে।

জুতোর গোলমাল কিনা দেখুন—বলতে বলতে প্রায় দু'শো স্কোয়ার ফুটের লিভিং রুমের কোণে ফ্রিজের ছাদে নুনদানি থেকে রানী নুন এনে গরম জলে মিশিয়ে দিলো।

ওই কেডস্ পরেই তো রোজ ভোরে হাঁটি।

বাড়ির কাজ করে দিয়ে যায় রানী। ইডেনে ক্লাব হাউসে বসে আজ চার পাঁচ বছর টেস্ট ম্যাচ দেখেন শরদিন্দু। সপরিবারে। সেজন্যে একটা দূরবীন কেনা হয়েছিল। তপু ইউজ করতো। মাঝে মাঝে তপুর মা চোখে লাগিয়েছে। চোখ এড়ায়নি শরদিন্দুর। মাঠের প্লেয়ারদের চেয়ে চোখে দূরবীন লাগানো নিজের বউকে দেখতে অনেক বেশি ইণ্টারেস্টিং লাগে তাঁর।

এই দূরবীনটা চোখে লাগিয়ে শরদিন্দু এক একদিন তাঁর টেনথ ফ্লোরের ঢাকা বারান্দা থেকে রানীদের ঘরবাড়ি মানুষজন একদম কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। গুরুসদয় দত্ত রোডের খানিকটা নন্দনকানন, হর্ম্যরাজি—খানিকটা সেনাব্যারাক আর সাউথ ক্লাব—এরই ভেতর দেবদারু রেনট্রির আড়াল আবডাল ফুঁড়ে দূরবীনের লেন্‌সে মাটির উঠোন, টালির ছাদ এসে ঠেকেছে। একদিন শরদিন্দু ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দূরবীন চোখে কলকাতার স্কাইলাইন দেখছিলেন। একটু ঝুঁকে পড়তেই বিকেলবেলার রানী—দূরবীনের কাচের গোড়ায় এসে চুল বাঁধছিল—যেন একদম কাছে—চুলের ফিতে দাঁতে কামড়ে ধরেছে। এই দূরবীনটা বড় বিশ্বাসী। আলো আর অস্ত্রকে কেউ ফাঁকি দিতে পারে না।

১৬৫০ স্কোয়ার ফুটের দুপ্লে ফ্ল্যাট। খানিকটা দশতলায়। খানিকটা ন'তলায়। মাঝখানে দুই প্যাচের একটা সিঁড়ি। ল্যাণ্ডিংটা রীতিমত চওড়া—তাতে লোহার ওপর ফুলের কাজ করা সাদা ইমালসন পেইণ্ট মাখানো দুধ রঙের বেঁটে রেলিং। একটু আগে ওখানে দাঁড়িয়ে মাথার চুল খুলে দিয়ে তপুর মা চান করতে যাবার সময় নেমে যেতে যেতে বলে গেছে—ঠাণ্ডা গরম দু'রকম জলে পা ডোবালে ব্যথা কমবে। ঠাণ্ডা জল দিতে বোলো রানীকে।

শরদিন্দু শেক পেয়ে পায়ের ব্যথার জায়গাটা ডান পায়ে ডলে দেখলেন। ভাল লাগলো। রানীকে আর বলা হোল না। ওই অবস্থাতেই শুয়ে পড়লেন। আজ ক্লাবের মাঠে রাত থাকতে শর্টস্ পরে

ঢুকেছেন। চার পাক দিয়েছেন সারাটা মাঠ। তার মানে অন্তত তিন মাইল হবে। তারপর ব্যায়ামের টিচার এসেছিলেন ভোর ছ-টায়। পেটের ব্যায়াম ন-সেট। আসন চারটি—দু' সেট করে। চিরতার জল একগ্লাস। মধু দিয়ে, লেবু দিয়ে আরেক গ্লাস জল। রসুনের কোয়া আর মুড়ি। তবে না এত ট্রিম আছেন শরদিন্দু। মহামান্য হাইকোর্টের নবীনতম বিচারপতি। দু-টি মর্তমান কলা, এক গ্লাস বরফ ঠাণ্ডা দুধ, একটু পাটালি আর তিন ফালি নারকেল। এসবও খাওয়া হয়ে গেছে তিন ঘণ্টা হয়ে গেল।

আরামে বাঁ-পা টান টান করে দিলেন শরদিন্দু ঘোষাল। সারাটা শরীর চনমনে। কোথাও কোন ফ্যাট নেই। জুডিসিয়ারি থেকে এত কম বয়সে কেউ বড় একটা হাইকোর্টে আসেন না। ওখানে যেতে যেতে অনেকের চুল পেকে যায়। তাও গিয়ে পৌঁছান হয় না। বার থেকেই বেশির ভাগ বিচারপতি এসে থাকেন। যে-বয়সে শরদিন্দু ওখানে এসেছেন—তাতে পরিণত বয়সে তাঁর সুপ্রীম কোর্টে যাওয়া একরকম নিশ্চিত। চাই কি তিনি ভারতের প্রধান বিচারপতি হয়ে রিটায়ার করতে পারেন।

এসব ভাবতে ভাবতেই টি ভি-র দিকে চোখ গেল শরদিন্দুর। রানীর পরনে ডুরে শাড়ি। এ ঘরে ঢুকবার মুখে সব সময় আঁচল তুলে দেয় মাথায়। এখনো দিয়ে নিয়েছে। এত উঁচুতে কোন ধুলো উঠতে পারে না। তবু নীপার আদেশ। রোজ একবার করে সব ফার্নিচার মুছতে হয় রানীর। হসটেল থেকে ছুটিতে তপু এলে তার দু-একটা প্যাণ্ট-শার্টও কেচে দেয় রানী।

মেয়েটির নাকটা চাপা। রোগা ফুল-আঁকা ব্লাউজটা রানীকে কিছু ইণ্টারেস্টিং করেছে। পেছন থেকে তাই মনে হোল শরদিন্দুর।

তোমরা এখান থেকে কত দূরে থাকো?

রানী ঘুরে তাকালো। চ্যাটালো খোলা বুক। লম্বা শরীরটার

সবটাই খাটের ওপর। জজ বাবুর বয়স যে ঠিক কত—তা বুঝতে পারে না রানী। পাজামার বাঁ-পায়াটা ভিজিয়ে ফেলেছেন।

আমায় বলছেন?

এখানে আর কাকে বলবো?

জলটা পালটে দেবো?

না। থাকুক। আবার পা ডোবাবো। তোমরা এখান থেকে কতদূরে থাকো?

ওই যে ব্যারাকবাড়ি—সোলজারদের—ওর পেছনে সাহেব বাগানে।

বাগান আছে নাকি?

হ্যাঁ। পোড়ো বাগান। সাহেবদের ভাঙা বাড়ি। রোজ লরি এসে ইঁট খুলে নিয়ে যায়। সুন্দর সুন্দর পাথর। জানালা। ওদিকটায় আমরা ক-ঘর থাকি। হেসে ফেললো রানী। কেন? আপনি যাবেন ওখানে? আর বলতে সাহস হোল না রানীর। সে তার স্বামীর কাছে শুনেছে—জজবাবু ইচ্ছে করলে ফাঁসি দিতে পারেন। মাঝে মাঝে দেন। সেসব কথা কাগজে ছাপা হয়।

একদিন ঘুরে এলে হয়। জায়গাটার নাম কি?

শুয়ে শুয়েই কথাগুলো আন্দাজে বলে যাচ্ছিলেন শরদিন্দু। অনেকদিন পরে তাঁর নিজের মনে হচ্ছিল তিনি বিচারপতি বা স্রেফ স্বামী নন—একজন পুরুষ। যাঁর কিনা লোভ হয়। নিজের কথা শুনতে শুনতে শরদিন্দু দেখলেন রানীর বয়স বড় জোর পঁচিশ। কোমরটি পাতের মত। ছোটো, কিন্তু চ্যাপটা পিঠ। তাতে অবশ্য ব্লাউজের সেই ফুলগুলো। এমন কোমর নিশ্চয় ডায়েটিং করে হয়নি।

বললাম তো। সাহেব বাগান। গাড়ি থেকে নেমে বলবেন তেরো নম্বর কোন্‌দিকে।

তোমাদের বাড়ি তেরো নম্বর?

উঁহু। আমাদের লাইনটার নম্বর তেরো। অনেকগুলো ঘর তো!

বস্তি ?

বলতে পারেন। সেই ধোপার মাঠ অব্দি। জমিদার খাজনা নিতো আগে। এখন ভাড়ার ব্যবস্থা হয়েছে মাসকাবারি।

কল-বাথরুম ?

কয়েকঘরের লাইন পিছু একটা করে।

মেঝে ?

মাটির। তবে চাদ্দিকে ইঁটের বাঁধুনি।

তোমার স্বামী কি করে ?

কাঠের মিস্ত্রি।

তবে তো ভালো টাকা পায়।

যেদিন যেদিন কাজ থাকে। সবদিন তো আর কাজ পায় না।

একদিন সঙ্গে করে আনবে। আলাপ করবো। আমাদের কাজ থাকলে মাঝে মাঝে করে দিয়ে যাবে।

বলেছিলাম আসতে। তা আসে না।

কেন ? অবাক হয়ে তাকালেন শরদিন্দু। শুয়ে শুয়েই।

আপনাকে খুব ভয় খায় !

আমাকে ? উঠে বসতে গেলেন শরদিন্দু। দেখেছে আমাকে ?

নাঃ। আপনি যে ফাঁসি দেন।

হোহো করে হেসে ফেললেন শরদিন্দু। আমার বাঁ-পায়ের আঙুলগুলো একটু টেনে দাও তো।

রানী পিছিয়ে গেল।

দাও না। কিছু হবে না। নিজের কানে নিজের গলা খুবই ক্ষীণ লাগলো শরদিন্দুর। ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডে যাকে বলে অ্যাডাল-টারি। বাংলায় ব্যভিচার। এই ধারায় ফুসলানো, কারও ঘরভাঙা—সবকিছুর দোষ বর্তায় শুধু পুরুষে। নারীর কোন দায় নেই। সে যেন অ্যাগ্রিভ্‌ড্‌ পার্টি।

রানী তাঁর বাঁ-পায়ের ভিজে আঙুলগুলো টেনে দিচ্ছিল।

ভালোই লাগলো শরদিন্দুর। রানী ঘুরে আবার টি ভি-র ক্যাবিনেট মুছতে যাচ্ছিল। পাতলা কোমর। এক স্লাইজ বিফ স্টেকের ধারা সমান সিধে পাতলা পেট নাভি সমেত ডুবে শাড়ির ভেতরে নেমে গেছে। তাতে সামান্য চর্বির কোটিং।

উঠে বসলেন শরদিন্দু ঘোষাল। আরেকবার এমন উঠে বসেছিলেন। অনেকদিন আগে। বিলেতে পড়বার সময়ে। অল্পবয়সী বিধবা ল্যাণ্ডলেডিকে দেখে ছাত্র শরদিন্দু চঞ্চল হয়ে পড়েছিলেন। পেছন থেকে জাড়য়ে ধরতেই তিনি ধরা দিয়েছিলেন। সেই প্রথম কোন রমণীর সঙ্গে শরদিন্দুর গাঢ়, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। নেশা আর স্বপ্নের ভেতর দিয়ে কেটে গিয়েছিল প্রবাসী ছাত্র শরদিন্দু ঘোষালের। লণ্ডনের এপ্রিল সেবারে ছিল নানা রঙের ফুলের বসন্ত।

সে ঘোর ফিকে করে দিয়েছিল নীপা। বিয়ের পর ধাপে ধাপে তিনি চাকরিতে উঠেছেন। নীপাও একটু একটু করে অলস আর মোটা হয়েছে। ছাত্র জীবনের ক্লারা—এপ্রিলের লণ্ডন—নীপা এসেই মুছে দিয়েছিল। সেই নীপাও এখন বিশেষ কাটের ব্লাউজ দিয়ে—ময়েসচারাইজার দিয়ে—নিটুট থাকতে চাইছে।

এসব কিছুই দরকার হয় না শরদিন্দুর। শরীরটাকে ব্যায়াম দিয়ে, খাদ্য দিয়ে, অন্যরকম করে রেখেছে। সেই সঙ্গে মাত্রামাফিক সফ্‌ট হুইস্কি, বাছাই বই, আইনের ভেতর বুদ্ধির ড্রিল করে করে শরদিন্দু পৃথিবীর ভেতরকার রস, তাপ ইত্যাদি মন দিয়ে, শরীর দিয়ে নিজে নিজেই টের পান। টের পান—পৃথিবীর এই রমণী তাঁর, এই রাস্তা তাঁরই মোটরগাড়ির দৌড়োবার চারণভূমি,—নিসর্গ কখন দৃশ্য—তাও তাঁরই মন বলে দেয়। চোখ চেখে নেয়।

কাছে এসো! শরদিন্দু ঘোষাল তার চেয়ে প্রায় পনেরো বছরের ছোট কাজের মেয়েটি—রানীকে পেছন দিক থেকে দু'হাতে আকর্ষণ করলেন। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে রানীর গালে চুমু রাখতে গেলেন।

করছেন কি বাবু! এ মা!! এ কি করছেন দাদাবাবু!

ঝাড়ন হাতে রানী দেওয়ালের দিকে সরে গেল।

ওর মুখে হাসি। সঙ্গে বোধহয় কিছু রাগ। হাত দিয়ে কপাল ঘষলো। বাইরে উঁচু আকাশ থেকে গরম হাওয়া তেতে গিয়ে দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকছিল।

শরদিন্দু একবার ভাবলেন, আরও এগোনো দরকার তাঁর। সাহসী না-হবার কোন কারণ নেই। আবার মনে হোল, বোধহয় পেছানো দরকার। এখুনি পেছানো দরকার। নয়তো আরও কোন কেলেঙ্কারী।

সাহস আনো বুকে শরদিন্দু। এসব সময় পয়লা স্টেপ রং হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে শুধরে নিতে হয়। শুধরে নিতে জানা চাই।

দু'হাত দিয়ে সামনাসামনি রানীর দু'খানা কাঁধ ধরে ফেললেন শরদিন্দু। ব্লাড ক্লোয়েসটল থেকে সাবধান হবার জন্যে ডাক্তাররা যাকে বলে থাকেন—লিন মিট। ছিমছাম! অথচ সিধে হয়ে দাঁড়ানো —ভেতরে ভেতরে একটা লুকনো তেজ সবসময়।

এতে কিছু হয় না রানী। ভয় পাচ্ছো কেন শুধু শুধু। এতো এমনি এমনি—এসো—

নাঃ! ছি ছি—আমি ভাবতেই পারিনি। না না--অমন করবেন না।

বৌদিদিমণি এসে পড়বেন! ভয় নেই রানী। ওর কলঘর ছাড়তে এখনো অনেক দেরি।

আমার মাথায় আসছে না বাবু। আপনি যান।

এবারে শরদিন্দু বুঝতে পারলেন। ভুল জায়গায়—একদম ভুল কাজ হয়ে গেছে। সে পিছিয়ে এসে আবার বিছানায় শুতে শুতে বললেন, তোমার বৌদিদিমণিকে এসব আবার বলতে যেও না। বুঝলে।

যেন কিছুই হয়নি। শুয়ে শুয়ে শরদিন্দু তাঁর চোখ রাখলেন ইংরিজি কাগজে—সকালে যা বার দুয়েক পড়া হয়ে গেছে। কোন

হরফ দেখতে পাচ্ছিলেন না। রানীর পায়ে কোন জুতো নেই। কাজের মেয়েরা বাড়ির ভেতরে কোন শব্দ না করেই বেড়ালের পায়ে হাঁটতে পারে। রানী নিশ্চয় এখন লিভিং রুমে ইলেকট্রিকের কমপ্লিট কুকিং সেটের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ওখানটাই বাড়ির ভেতর সবচেয়ে সুন্দর দেখতে। ঘিয়ে সাদা রঙের ইমালসন মাখানো হট বক্স। তার পাশে কাবাব বানানোর ওভেন। এই ব্যাকগ্রাউণ্ডে ডুরে শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানী। তাই তো আন্দাজ শরদিন্দুর।

নাইনথ ফ্লোরের বাথরুম থেকে নীপা বেরুলো। দুপ্লে সিঁড়ি দিয়ে এইমাত্র সুগন্ধী ভিজে গন্ধ টেনথ্ ফ্লোরের লিভিং রুমে চলে যাচ্ছে। কথা বোঝা যাচ্ছিল না। কিন্তু এ নিশ্চয় রানীর গলা। নীপা বোধহয় মাথা মুছতে মুছতে গান ধরেছিল গুনগুন করে। সব গান থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শরদিন্দুর চোখের সামনে সারা কাগজখানার হরফ কালিডলা কালো হয়ে গেল।

সারা বাড়ি চুপচাপ।

শরদিন্দু বুঝলেন, এবার তার অপেক্ষা করতে হবে। কখন নীপা এসে ঘরে ঢোকে সেজন্যে। এ অপেক্ষার প্রতিটি পল তার রক্তের ভেতর একটি করে স্টোনচিপের টুকরো ছুঁড়ে দিচ্ছে। উঃ! আর পারা যায় না। বিশ্বাস করো নীপা—ভালো যদি বাসি সে তো শুধু তোমাকেই। এ সম্পর্কে তোমার কি কোনো সন্দেহ আছে? বিয়ের এত বছর পরে আমায় কাইণ্ডলি অপমান কোরো না।

রানীর গলা ধ্যাস ধ্যাস করে কী সব বলে যাচ্ছে।

সিঁথিতে অনেকটা সিঁদুর। হাতে চিরুনী। ঘরে ঢুকেই নীপা বললো, আচ্ছা তুমি কি বলতো?

মুখের ওপর থেকে কাগজ না সরিয়েই শরদিন্দু ঘোষাল বললেন, কী ব্যাপারে নীপা—যেন কিছুই হয়নি এমনি একটা গলা সময় সময় বের করতে পারেন জাস্টিস শরদিন্দু ঘোষাল। কাঠগড়ায় দাঁড়ানো সাক্ষী জেরার মুখে পড়ে এমন গলা শুনতে পেয়েছে অনেক সময়।

নিস্পৃহ গলা। জাস্টিস ঘোষাল এই গলায় সরকারী উকিল, সাক্ষী, আসামীপক্ষের সওয়াল জবাবের সামনে দরকারী পয়েন্ট তুলে ধরেন সাধারণতঃ।

নীপার গলা চাপা। থমথমে। সেবারে বাঁকুড়ায় এক কাণ্ড করেছিলে। কৃষ্ণনগরে থাকতে জল তুলে দিয়ে যেতো যে-মেয়েটি তার নাকি— !

শরদিন্দু নীপার চোখে চোখ চেয়ে বললেন, বলো। আর কি কি জানো বলে যাও।

ভাল কিছু নয়। জল তুলে দিয়ে যাওয়ার সময় মেয়েটির পেছনে হাত রেখেছিলে না!

পেছনে? কি বলছো নীপা?

হ্যাঁ। তার পাছায় হাত রেখেছিলে পেছন থেকে। সে জলের কলসী নামাচ্ছিল তখন। তুমি তখন জেলা সদরে সাবজজ। রানাঘাটে এক বালিকা বিদ্যালয়ে প্রাইজ ডিস্টিবিউসন করে এসেছো!

জেলায় থাকতে অনেক কিছুই করতে হয় অফিসারদের।

তা তো বটেই। হাইকোর্টে এসে কাজের মেয়েমানুষকে জড়িয়ে ধরছো।

কী বাজে বকছো নীপা? উঠে বসলেন শরদিন্দু।

ছি ছি ছি! গেরস্থ বাড়িতে এসব কেন? শহরে তো যাবার জায়গা আছে। সেখানে যেতে পারো। না, হাইকোর্ট জাজ বলে ধরা পড়ে মান যাবে!

শরদিন্দু দেখলেন, নীপার নাকের নিচের দু'ধারে সুন্দর জায়গায় দু'টি ভাঁজ পড়েছে। মনে মনে বললেন, এত তাড়াতাড়ি? কিন্তু এসব হিসেব করার—বা হিসেব নেওয়ার সময় এটা নয়। কথা বলতে গিয়েও জড়িয়ে যাচ্ছিল। যতটা আওয়াজ তার গলায়—তা একদম আসছিল না। নিজের কানেই নিজের কথা জোরালো লাগলো না। কী বলতে চাও তুমি? রানী। শুনে যাও এদিকে।

কী বলতে চাই! রানী এসে দরজায় দাঁড়ালো। শরদিন্দু সেদিকে সরাসরি তাকাতে পারছিল না। একবার তার মনে হোল—রানীর ঠোঁটে চেরা হাসি। ছিমছাম—ছিপছিপে—তাই নাহয়—

কি? ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলো তো—ওকে তুমি জড়িয়ে ধরোনি?

একদম পাগল হয়ে গেছ তুমি নীপা—

তা তো বটেই! অল্পক্ষণের জন্যে বাথরুমে গেছি। এর ভেতর এত কাণ্ড?

কি কাণ্ড?

বলো জড়িয়ে ধরেছিলে কি না?

না।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে 'না' বলো তো

শরদিন্দু রানীর মুখে তাকালো। রানী চোখ নামালো না। যেন গুরুসদয় দত্ত রোডের এই টেনথ্ ফ্লোরে ওর ন্যায্য পাওনা এই সিনেমাটি দেখতেই ও আজ সকালে এখানে এসেছে।

আমি তোমায় জড়িয়ে ধরেছি রানী? একথা বলতে পারলে? আমি টি-ভি-র ওপর থেকে ম্যাগাজিনটা নিতে গেছি—আর অমনি তুমি ঘুরে যাচ্ছিলে বলেই না আমার হাত—

শরদিন্দু অগোছালো ভাবে থেমে গেল। রানী নিচের পাটির দাঁতে দাঁত ঘষে বললো, কেন মিথ্যে বলছেন দাদাবাবু। আমরা তের নম্বরে থাকি। খেটে খাই। আমার মিথ্যে বলে লাভ!

নীপা লুফে নিলেন কথা। সত্যিই তো! রানী না হয়ে অন্য মেয়ে হলে তো চেপে যেতো। চাই কি তোমার মন বুঝে চলে মাসে মাসে টাকা নিতো। আর তুমি গোপনে গোপনে দিয়ে যেতে।

না বৌদিমণি। আমরা তেমন মেয়ে নই। পাঁচ বছর বয়সে বে হয়ে তের নম্বরে এসেছি। চার ছেলেমেয়ের মা আমি। গতরে খাটি—খাই দাই—তাই আমার বয়স বোঝা যায় না। এই ঠিক

চব্বিশ চলছে আমার। ছেলেমেয়ের বাপ—কাঠের মিস্ত্রি জগাইকে ডেকে আপনি শুধোবেন বৌদি। আমি কখনো মিছে কথা বলিনে।

খুব ভালো মেয়ে তুমি রানী। এবাড়ি থেকে তোমার কোনদিন কাজ যাবে না। বৌদিকে বলতে বারণ করে দিয়েছিলে তুমি। চেপে তো যায়নি রানী। চুপ করে গেলেন নীপা। তখনো শরদিন্দু কোন কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এভিডেন্স অ্যাক্টে উকিল যে ভাবে মামলা সাজায়—তার চেয়ে নীপার সাজানো কোনদিক থেকে নরম নয়। শরদিন্দু বুঝতে পারছিলেন আর ভেতরে ভেতরে আরও বেশি করে সেঁধিয়ে গিয়ে একদম বোবা হয়ে যাচ্ছিলেন। যে-কথাই তার মুখে আসছিল—মন বারণ করছিল—বোলো না শরদিন্দু—বললে, কেস আরও ঢিলে হয়ে যাবে।

শরদিন্দুর অবস্থা বেশ কাহিল। কেন যে এমন অ্যাডভেঞ্চারে গেলাম। কোন দরকার ছিল না। ঝুটমুট ঝামেলা। তিনি সোজাসুজি তার স্ত্রী নীপার মুখে তাকাতে পারছিলেন না। পারছিলেন না রানীর চোখে চোখ রাখতে। অথচ আগামীকাল হাইকোর্টের করিডরে তিনি যখন দুপুরবেলা হেঁটে যাবেন—তখন কতলোক তাঁর চোখে চোখ রাখতেই সাহস পাবে না।

যা রানী—তুই একবারটি রেকর্ডগুলো মুছে খাপে ভরে রাখ। মেশিন চালিয়ে দিবি রেকর্ড চাপাবার পর। তারপর ভেলভেট কাপড়টায় ওই শিশির তেল ঢেলে নিবি একটু। ভিজে ভেলভেট রেকর্ডে চেপে আলতো করে ধরে রাখবি—দেখবি সব ময়লা উঠে এসেছে।

এত ওপরে তো ধুলো নেই বৌদি। আগের রোববারও মুছেছি।

যা বলছি তাই কর। গান শোনার সময় কিচকিচ আওয়াজ হচ্ছিল।

চোখের সামনে থেকে রানী সরে যাওয়ায় শরদিন্দু ঘোষাল হাঁফ ছাড়লেন। সকালটা শুরু হয়েছিল এমন সুন্দর করে। আর কী হয়ে

গেল শেষ অব্দি। আইনের দর্শনের নাম জুরিসপ্রুডেন্স। প্রুডেন্স বলেও তো একটা কথা আছে। জীবনকে সর্বসময় বিচক্ষণভাবে চালাতে হয়। একদিকে একটু টাল খেলেই সব গোলমাল।

নীপা এবার সত্যিকারের বিষ ছড়িয়ে মুখ খুললো। তোমাদের পুরুষমানুষের বলিহারি রুচি। যে কোন একজন মেয়েমানুষ হলেই হয়।

আস্তে কথা বলো।

ঢাকাঢাকির আর কি দরকার? এবার থেকে বেগ উঠলে সিধে ওসব পাড়ায় চলে যেও। ড্রাইভারকে আমি বলে রাখবো।

লোক হাসাচ্ছো কেন নীপা?

হাসালে তো তুমি।

আমি তোমায় ভালবাসি নীপা।

রাখো। ভালোবাসার কথা ও মুখে বোলো না। ভাগ্যিস তপু এখন হসটেলে। এখানে একটু থামলেন নীপা ঘোষাল। তারপর আবার শুরু করলেন। রানী মেয়েটা ভালো। আমি বাথরুম থেকে এসেছি সবে। বলে—বৌ-দিদিমণি—এই দেখুন—আমার সারা শরীর কাঁপছে। দাদাবাবু এইমাত্র আমায় জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছেন। আমি তো শুনে আকাশ থেকে পড়লাম।

চুমু খাইনি নীপা। বিশ্বাস করো। ভগবানের নামে শপথ করে—

সব আসামীই অমন শপথ করে। বেশ—চুমু খাওনি বোলছো মেনে নিলাম। গোড়ায় তো বলেছিলে—জড়িয়ে ধরতে যাওনি—ম্যাগাজিন আনতে গিয়েই এই কিষ্কিন্ধাকাণ্ড। এখন স্বীকার যাচ্ছো—জড়িয়ে ধরেছিলে তাহলে।

হ্যাঁ। প্রায় জড়িয়ে ধরেছিলাম।

প্রায় কেন। ফসকে পিছলে গিয়েছিল রানী?

শরদিন্দু সিধে নীপার চোখে তাকালেন। হ্যাঁ। আমিও জড়াতে গেছি—আর ও সরে গেছে। চুমু আমি খাইনি। আই সুইয়ার—

খেতে গিয়েছিলে ? গালে গাল লাগিয়েছিলে ?

তা লেগে থাকতে পারে নীপা।

ম্যাগাজিন আনতে গিয়ে এত কাণ্ড করে বসলে। তুমি এজলাসে বসে মহামান্য বিচারপতি সেজে দোষীকে সাজা দাও—বিচারে বসে নির্দোষকে খালাস দাও—তাই না ? নীপা এখানে থেমে থাকলো না। মেয়েটা কী দোষ করেছিল শুনি ? ওকে পায়ের আঙুল টানতে বলেছিলে ?

হ্যাঁ নীপা। মানুষের এমন হয়ে যায় মাঝে মাঝে—

আমি একজন মানুষ না ? তোমার চোখে আমি তাহলে কি ?

নীপা ঘোষালের গলা বুজে গেল। শরদিন্দু দেখলেন—তার চোখ জলে টলটলে হয়ে যাচ্ছে। তিনি যে এগিয়ে নীপার চোখ মুছিয়ে দেবেন—সে সাহসও তাঁর হোল না !

রেকর্ড মুছতে গিয়ে ভুল করে পিন চাপিয়ে ফেলেছিল রানী। তাই লিভিংরুম থেকে পুরো অর্কেস্ট্রা সমেত একটা খুব পরিচিত গান আস্ত বেজে উঠলো। শরদিন্দু গানের কোন লাইন বুঝতে পারছিলেন না তখন। এরকম একটা জগাখিচুড়ি অবস্থায় তাঁর আচমকাই মনে পড়লো—নীপা এখন সাঁইত্রিশ। আমার চেয়ে ঠিক দু'বছর পাঁচ মাসের ছোট। আমি আসলে চল্লিশে পা দিয়েছি।

॥ ২ ॥

রবিবারের দুপুর অন্য হপ্তায় বেশ আমোদে কেটে যায় নীপার। গান আছে। টেলিফোনে এই বাড়িরই অন্যদের খবরাখবর নেওয়া থাকে। থাকে কলকাতার নানা জায়গায় জমিয়ে ফোন করা। তপু হসটেলে যাওয়া ইস্তক তার অনেক কাজ কমে গেছে। সে রাতে বেগুন পোড়া খায়। দিনে সয়াবিনের মাংস। এত অবসর। তিরিশের ওপর কে উঠতে চায় ?

রানী রোজকার মত পরিবেশন করলো। টেবিলে দুজন মুখো-মুখি বসলো। কারও কোন কথা হোল না। রানীও সাহস করে কাউকে কিছু খেতে সাধলো না।

সন্ধেবেলা টি ভি খুলে সামনে বসে থাকলেন শরদিন্দু। পাশের ঘরে আলো নেভানো। কোন শব্দ নেই। নীপা চুপচাপ শুয়ে। ঘুমিয়েছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না এঘর থেকে।

এক সময় ফাঁকা বাড়িতে সব আলো নিভিয়ে দিয়ে শরদিন্দু এসে নীপার পাশে শুয়ে পড়লেন। এখানে এখন চৈত্র রাত্রের হালকা বাতাস বয়ে যাচ্ছিল। জায়গাটা শহর থেকে বেশ উঁচুতে। প্রায় আকাশের ভেতর। চলো নীপা—কালই সকালে কোথাও ঘুরে আসি।

নীপার পিঠে হাত রেখেছিলেন শরদিন্দু। এ-পিঠ রানীর পিঠের চেয়ে অনেক সুন্দর—সুগন্ধী। মাঝে মাঝে ভেপার বাথ নিয়ে থাকেন নীপা। তবু—তবু কেন আমি রানীকে জড়িয়ে ধরতে গেলাম। এটা কি সত্যি যে—একটু ময়লা—একটু ঘেমো—সাধারণ চিকন ফুল আঁকা ব্লাউজে ঢাকা পিঠ—বয়সের টান টান মেয়েলী পেট—ডুরে শাড়ির লাল কালো মোটা দাগগুলো আমায় বাঘের কায়দায় গভীর বনে আকর্ষণ করেছিল?

খুব নাটুকে লাগছিল নিজেরই কথাগুলো নিজের মনে। কিন্তু এ অবস্থায় আর কি কথা ভাবতে পারতেন শরদিন্দু। তাঁর হাত ইচ্ছে মত ঘুরতে থাকায় শরীরের মালিক কঠিনভাবে সে হাত সরিয়ে দিলেন। ভালো লাগছে না বলছি। ঘুমোতে দাও—

ঘুম এসে গেলে কেউ কথা বলতে পারে না নীপা।

সরে শোও বলছি। আমার ঘেন্না করে।

বেশি রাত অব্দি পাশাপাশি এভাবে শুয়ে থাকার পর শরদিন্দু বললেন, তাহলে আমি কি করবো নীপা।

কুকুর বেড়ালের মত যেখানে সেখানে ইচ্ছে হলে বাড়ির মধ্যে

আর এনো না ব্যাপারটা। খারাপ জায়গায় যাও। আমার কোন আপত্তি নেই।

শরদিন্দু অন্ধকার ঘরে অনেক রাত অব্দি জেগে থেকে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন। অনেক সময় মানুষ খারাপ শরীর থেকে অনেক কিছু করে ফেলে। আবার সুস্থ শরীর থেকেও মানুষ অনেক কিছু করে বসে। এখানে আমার শরীরটাই দায়ী। আমি সুস্থ। খিদে পেলে খাবার খাই। তার জন্যে কোন লজ্জা নেই। অপমান নেই। টেনশন নেই। ইচ্ছে হওয়াতে রানীকে জড়াতে গিয়েছিলাম। আমার মত পুরুষে রানী অভ্যস্ত নয়। অভ্যস্ত হলে পিছলে যেতো না। পিছলে গিয়ে সত্যবাদী হওয়ায় আজ আমি এ অবস্থায়। লজ্জা, অপমান, টেনশন। এসবই সভ্যতার গাঁট। আমি নিজেও নীপার বেলায় সভ্যতার এই গাঁটগুলো ধরে বসে আছি।

ভোররাতে ছুঁচলো সব আলোর লাইন ঘরে ঢুকে পড়ে ক্লান্ত, অবসন্ন শরদিন্দুকে বিছানা থেকে তুলে দিল। হাত পা গুটিয়ে নীপা ঘুমিয়ে যাচ্ছিল।

শরদিন্দু ব্যালকনিতে এসে কলকাতার স্কাইলাইনে তাকালেন। এর এক জায়গায় হাইকোর্ট। হাওড়া ব্রিজ। শহীদ মিনার। কিন্তু আকাশের গায়ে ঝুলন্ত বাসাবাড়িগুলোর আড়ালে পড়ে গেছে ওসব। চারদিকে হাইরাইন। দূরবীনটা নিয়ে এসে আবার দাঁড়ালেন।

রানীদের তের নম্বর এখনো জাগেনি। এমন ঘষামাজা এলাকার ভেতর পোড়ো সাহেববাগান জুড়ে বস্তিবাড়ি। দূরবীনে ওদের উঠোনের কলতলাও পরিষ্কার উঠে এলো। একটা কোন গাছ তার পাশে।

আমার যদি ডানা থাকতো—যদি নিচে পড়ে গিয়ে ব্যথা পাবার ভয় না থাকতো—আমি এখুনি ব্যালকনির বাইরে ঝাঁপ দিতাম। উড়ে উড়ে গিয়ে দেখে নিতাম, জগাই মিস্ত্রির বউ রানী তার নিজের ঘরসংসার কী ভাবে করে। ঠিকে? সারাদিন থেকে রাতে চলে যাওয়া? না, জীবনভোর। আমি আচমকা জড়িয়ে ধরতে এত বুক

কাঁপারই বা কি ছিল। জগাই তোমায় জড়ায় নি? পাঁচ বছরেরটি বিয়ে হয়ে তের নম্বরে এসেছিলে। চব্বিশ বছর বয়সের ভেতর চার ছেলেমেয়ের মা। অ্যাতো তো কাঁপার কথা নয়। ওঃ! আমি একজন মহামান্য বিচারপতি? তাই। আমাদের বাসাবাড়ি শূন্যে ঝুলন্ত আর কিছু চকচকে? তাই।

এবার শরদিন্দু দূরবীনের চোখ রাখার দিকটা তের নম্বরের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। আর দৃশ্য ভেসে ওঠার জায়গায়—দূরবীনের উল্টো দিকে চোখ রাখলেন।

তের নম্বর তার কলতলা সমেত যে কতো দূরে চলে গেল। আগের চেয়ে অনেক ছোট হয়ে গেছে। টালির ছাদ থেকে টিনের খাপরার চাল—আর আলাদা করা যাচ্ছে না। সব ছোটো ছোটো। একাকার হয়ে গেছে।

১৭ এপ্রিল। সোমবার। সাল বলার কোন দরকার নেই।

যে সব অবস্থা এখন লিখতে যাচ্ছি—তাতো যে কোন শতাব্দীর যে কোন সালেই ঘটতে পারে।

মসলন্দপুর-চাঁদপাড়া ৮৪ নম্বর বাস রুটের টাইমকিপার নিতাই দস্তিদার আর বাস ড্রাইভার মনোরঞ্জন শিকদার তিন বছর আগে এক হরতালের সকালে বাস বের করতে না পেরে একই সঙ্গে পাগলা চণ্ডীর বিলের বাঁধ ধরে বাড়ি ফিরছিল। উল্টোদিক থেকে ফিরছিল সুবালা সরদার। স্টেশনের পাইকারীদের কাছে শসা বেচে দিয়ে। চাপড়ার মিষ্টিদোকানের কারিগর সুশীল সরদারের বউ সে। খবরের কাগজের ভাষায় শিকদার-দস্তিদার-সরদার মামলা।

সুবালা নাকি সামান্য হাসে। অবশ্য এই হাসির কোন সাক্ষী পাওয়া যায় নি। সুবালার বডি পাগলা চণ্ডীর বিলে ভেসে উঠেছিল। গুচ্ছের জাল টিকিটের বাণ্ডিল পাওয়া যায় বিলেরই গায়ে

কচুবনে। লোক এসে পড়ায় দস্তিদার-শিকদারকে তাড়াতাড়ি সরে পড়তে হয়। যাবার সময় কচুবনে শিকদার ফেলে যায় তার মানি-ব্যাগ। তাতে তার ফোটো ছিল।

উপর্যুপরি ধর্ষণ ও প্রমাণ লোপাটের জন্যে হত্যা। শুধু তাই নয়। হত্যার চিহ্ন মুছে ফেলতে ঝামা ইঁটের বড় দু'টি চাড় সুবালার শাড়ির পাড় দিয়ে তার বডির সঙ্গে বেঁধে সব শুদ্ধ জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। বডি তলিয়েও গিয়েছিল। কিন্তু কচ্ছপ বা অন্য কিছু শাড়ির পাড় কেটে দেওয়ায় ঘণ্টা খানেকের ভেতর সুবালা ভেসে ওঠে। শুরুতে ভাবা হয়েছিল—জলে ডোবা কেস। খবর পেয়ে সুশীল সরদার এসে জানায়—সুবালা একের নম্বরের জলের পোকা ছিল।

সেসনে তিনটি বছর ঝুলে থেকে স্টেটের আপিসেই মামলা রেফার হয়ে এখানে এসেছে। রেপ ফলোড বাই মারডার অ্যাণ্ড অ্যাটম্পট টু কনসিল কনসিকোয়েনসিয়াল এভিডেন্সস্। শিকদার—দস্তিদার—সরদার কেস।

আসামী পক্ষের উকিল অবশ্য কয়েকবারই বলেছেন, বাঁধের ওপর দিয়ে হেঁটে আসা সুবালা সরদারের মুখে প্রশ্রয়ের হাসি ছিল।

কিন্তু সে হাসি কে দেখেছে? আসামীর দেখার দাবি এখানে মূল্যহীন।

খুন হওয়া সুবালার পিঠের দিকে পুরুষের হাতের নখের কোন পেষণ বা পীড়ন চিহ্ন পাওয়া যায়নি। আসামী তরফে লোয়ার কোর্ট থেকেই প্রমাণের চেষ্টা চলছে—সুবালা হ্যাড কনসেণ্ট।

স্টেটের তরফে দাবি—ধর্ষণের অব্যবহিত পরেই যদি কাউকে গলা টিপে খুন করে জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে পেষণ বা পীড়ন চিহ্ন মুছে যেতে বাধ্য।

স্টেট যেভাবে কেস সাজিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে—প্রশ্রয়ের হাসি থেকে শুরু করে ধর্ষণ ও খুন সমেত জলে ডুবিয়ে দেওয়া অব্দি মোট সময় লেগেছে সাতাশ মিনিট। তারও পঞ্চাশ মিনিট পরে

সুবালা সরদারের বডি ভেসে ওঠে। পাগলা চণ্ডীর বিল বহু পুরনো। কচ্ছপ আছে। আছে কয়াতি মাছ। কয়েক মাইল লম্বা বিলের সবটা এখনো কেউ জানে না।

আসামী তরফে নিতাই আর মনোরঞ্জনের আত্মীয়স্বজনরা এসেছে। শরদিন্দু ঘোষাল বুঝলেন, মানবজীবনে প্রশ্রয়ের হাসি ও দুই উরু প্রসারিত করে পুরুষকে গ্রহণ কোন নতুন ঘটনা নয়। চিরকালই ছিল। থাকবেও। কিন্তু এর সঙ্গে সভ্যতা যুক্ত করেছে—বিবাহবন্ধন, অধিকার ও দখল, লজ্জা, অপমান, টেনশন ও শাস্তি। তাই সাতাশ মিনিটের ভেতর এক জোড়া বলাৎকার সমেত খুন ঘটে যায়।

২৮ এপ্রিল। শনিবার। এখন আদালতের ছুটি যাচ্ছে। ভোর চারটে বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট।

নীপা ইংরাজী মতে ২৭ এপ্রিল রাত ১১টা ৩৫ মিনিট গতে প্রসারিত উরুতে আমাকে গ্রহণ করে। আমি শরদিন্দু ঘোষাল চাই কি আর দশ বছরের মাথায় মাথায় সুপ্রীম কোর্টে গিয়ে বসতে পারি। কাল রাতে আমাদের মিলন হয়ে যায়। আমরা আবার আগের মত হয়ে গেছি। আসলে দিনের বেলাতেই মিলন হয়। রানী আমাকে আর নীপাকে চা দিতে এসে হেসে ফেলেছে। তখন আমি গলা মোটা করে বলি—শোনো রানী। আমি আবার আগের মতই তোমার দাদাবাবু হয়ে গেলাম। অন্য সব কথা ভুলে যাও তো।

আমি তো ভুলেই গেছি দাদাবাবু। ওসব কিছু নয় আমি জানি।

এ কথায় নীপাও আমার চোখে তাকিয়ে হেসে ফেলে।

তা রাত ১১টা ৩৫ মিনিট গতে—গতকাল রাতে—মানে এখন থেকে ঠিক পাঁচ ঘণ্টা আগে নীপার ইচ্ছে আমি সাধ্যমতো পূর্ণ করার চেষ্টা করি।

ওর শরীরে এই সময় খুব জোর আসে।

আমি ভোরটা বেছে নিয়েছি হাঁটার জন্য। কারণ, এই পৃথিবীতে ন্যায়-অন্যায়, বিচার-অবিচার, সাজা বা খালাস বাদ দিয়েও দিন দিনই টের পাচ্ছি—হজম ও ভোগের ভেতর দিয়েই বেঁচে থাকার, সব কিছু দেখার আনন্দ টের পাওয়া যায়।

খানিকক্ষণ ডিফেমেশন চ্যাপ্টারটা পড়লে আয়নায় আমার গোঁফের ডগা রাসভারি ও বিদগ্ধ দেখায়।

একমন দিয়ে ইতিহাস পড়ে দেখেছি। চোখ মুখ ফুলে যায়। তাতে কয়েক শতাব্দীর বিষাদের প্রলেপ থাকলেও কী একটা আনন্দ যেন থেকে যায়।

এই যে হাঁটছি—হাঁটতে হাঁটতে ঘাম ফুটে উঠবে। বাড়ি ফিরে ফ্রিজ্যাণ্ড ও আসন। তার পরেই গরম জলে মধু আর লেবুর রস দিয়ে একটি পুরো গ্লাস। আঃ! মনে হয় কোনদিন মরবো না। এরকমই থাকবোই।

স্টেডিয়াম ছাড়িয়ে গুলমোহর গাছগুলোর কাছাকাছি একজন এগিয়ে এসে বললো, শিকদার দস্তিদারদের কথা যদি আপনি একটু বিবেচনা করতেন। দু'জনারই বউ ছেলেমেয়ে আছে—

হাতের ওয়াকিং স্টিক উঁচু করে ধরলেন শরদিন্দু। সাহস তো কম নয়—বলেও দেখলেন, তার নিজেরই বুক কেমন ধড়মড় করছে। এ কি রাগে? না বে-আইনী বলে?

যে গেছে সে গেছে। আর তো ফিরবে না। যারা আছে—তাদের তো দেখবেন। মেয়াদ খাটান। কিন্তু একদম নিকেশ করে দিয়ে কি লাভ বলুন!

কত বুঝদার—সমঝদার ভঙ্গী মুখ। যেন শরদিন্দুর পক্ষে উপকারী কোন অনুপানের কথা একজন সিনিয়র কবিরাজ হিসেবে লোকটি বুঝিয়ে বলছে তাকে।

হাতের ওয়াকিং স্টিকটা তুলেই শরদিন্দু তাড়া করলেন। এরকম লোক কোর্টের করিডরে ঢোলা হাতার পাঞ্জাবি পরে ঘুরে বেড়ায়।

হাফ প্যান্ট পরা ছিল বলে বেশ দৌড়াচ্ছিলেন শরদিন্দু। তার চেয়েও অনেক জোরে দৌড়ে লোকটা বিড়লা একাডেমির দিকে চলে গেল।

কোন লাভ নেই দৌড়ে। কাছাকাছি কোন থানা নেই। আউট পোস্ট নেই। লোকটিকে ধরে ফেলেও কোন লাভ ছিল না। কার কাছে হ্যাণ্ডওভার করতেন? মুখটা মনে রাখার চেষ্টা করতে লাগলেন শরদিন্দু।

॥ ৩ ॥

১২ মে শনিবার। বেলা তিনটে।

নীপার ঘরে দু'টো ব্যাটারি সেট প্রাণপণে এয়ারকুলার চালাচ্ছিল। নীপা জানে—এখন এখানে শরদিন্দু আসবে না। ঘর বন্ধ করে আলো জ্বালিয়ে এয়ারকুলার চালিয়ে সে পড়তে পারে না। হুইসল ডায়নেসটির ওপর তিনখানা বই এনেছে। পিঠ সিধে করে এখন কয়েকমাস ইতিহাস পড়বে তার স্বামী।

নীপা কিছুদিন ধরেই বুঝতে পারছে—তাকে দেখে শরদিন্দুর চোখ জ্বলে ওঠে না। শরদিন্দু হাতের কাজ—চোখের বই ভুলে যায় না।

অথচ আমি নীপা ঘোষাল এই চেহারায় আছি গত বারো বছর। এক ওজন। মুখে শসার রস মাখি। আর দাঁত মাজি মাংকি ব্র্যাণ্ডে। এ আমার ছোটোবেলার অভ্যেস। কতকগুলো ব্লাউজ তো পরাই হয়নি কতদিন। স্কার্ট পরতাম বীরেনের সঙ্গে। আমার কোলে মাথা রেখে শুয়েছিল একদিন। তখন একটা গান শোনাই। এমন প্রেমেই পড়লো। আমার বিয়ের পরও ওর গোড়ার দিককার গল্পগুলোয় আমি থাকতাম। এখন আর আমাকে নিয়ে লেখে না। লিখতেও হয় অনেক। সব পুজো সংখ্যায় থাকে বীরেন।

পুরুষরা যে আমাদের কতভাবে দেখতে পায়! আমি নিজেকেও নিজে অতভাবে দেখিনি। বীরেনের দেখার চোখ ছিল। একদিন শরদিন্দুর ছিল। তপু হতে গিয়ে আমার এত সব বাদ দিতে হোল। নইলে নাকি পরের বারে প্রাণ নিয়ে টানাটানি হতে পারতো। তাই —তপুর পর আমার আর কোন পরের বার আসেনি। আসবেও না কোন দিন।

ওঁকে এত লোক সম্মান করে—অন্ততঃ সম্মান করার ভাব দেখায় —বিশেষ করে একজন যদি অল্প বয়স থেকেই বড় হবার দিকে মইয়ের ঠিক ঠিক ধাপে পা দিয়ে টপাটপ উঠতে থাকে—তাহলে তার বউ প্রকাশ্যে এই সম্ভ্রমের বলি হয়ে পড়ে। আমি কোনদিন রাস্তায় স্বাধীনভাবে কোন কাটরায় ঢুকে ব্লাউজপিস দর করতে পারিনি।

তিন চার বছর আগেও শরদিন্দু আমায় লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতো। আমি তা জানতাম। ওকে দেখতে দিতাম। ওর প্রিয় ভঙ্গীতে আমি কতদিন একই হাসি অকারণে রিপিট করে গেছি। কিন্তু কতকগুলো রুচি ওর বড় সেকেলে। এখনো জরি পাড় শাড়ি পরলে আমাকে ওর ভাল লাগে। রোলেক্স কতদিন হোল বাতিল হয়ে গেছে।

দম্পতি হিসেবে আমরা যে কোন পার্টির লাইফ ছিলাম একসময়। এখন আর লাইফ নই আমরা। তবে সবাই আমাদের চেয়ে চেয়ে দেখে। ট্রিম, ঝকঝকে মহামান্য বিচারপতি ও তাঁর অমূল্য বউ।

আমার কোথাও ফোন করার নেই। আজই বিকেলে কারও আসার কথা নেই আমাদের কাছে। খারাপ চা-পাতা দিয়েছে বলে দোকানীকে ফেরত দিতে যাবারও কোন প্রোগ্রাম নেই। ফোন আসে না। কাউকে চিঠি লেখার নেই। শহরে এমন কোন ছবি আসেনি —যা না দেখলে জীবনটাই বৃথা মনে হতে পারে।

এবং চোখে ঘুম নেই। কারণ, কোন ক্লান্তি নেই। অথচ উৎসাহ বস্তুটা যে কি তা আমি নীপা ঘোষাল একদম মনে করতে পারছি না। এখন আমাদের সঙ্গে খুব কম লোক মেশে। কারণ, আমাদের সঙ্গে

মিশবার লোক এমন করে বাছাই করে এসেছি—যাতে লিস্টির নাম কাটতে কাটতে সবাই বাতিল হয়ে গেছে।

মন্দির, হ্রদ, পাহাড়, হটস্প্রিং, রিজার্ভ ফরেস্ট দেখে দেখে চোখ পচে গেছে। এখন আমার এই তিনটির ভেতর যে কোন একটি অত্যন্ত দরকারী—

(ক) কারও সঙ্গে চেনাশুনো কাউকে নিয়ে পেটভরে পরচর্চা করা।

(খ) আমার কোলে মাথা দিয়ে বীরেনকে কোন মাঠে শুইয়ে দিয়ে একটি গান গাওয়া।

(গ) আমায় দেখে শরদিন্দু হাতের কাজ—চোখের বই ভুলে যাক।

নীপা ঘোষাল দেখলেন, এর কোনটিই এখুনি হবার নয়। যার তার কাছে গিয়ে সে পরচর্চায় বসতে পারে না। বীরেন নিশ্চয় পুজো সংখ্যায় উপন্যাস লিখতে বসেছে। শরদিন্দু হাতের কাজে নির্ভুল। বই পেলে—বিশেষত ইতিহাসের—তাকে টেবিল থেকে সরানো কঠিন।

ফোমের বিছানা মানুষকে অলস করে দেয়। নীপা শুয়ে শুয়ে হাঁফিয়ে উঠলো। দরজা ফাঁক করলে শরদিন্দুকে দেখা যায়। দেখতে গেলে গরম ঢুকবে ঘরে। তার চেয়ে আজ বিকেলে রানী এলে বলতে হবে—তোর জগাইকে বলবি তো আসতে। এ খাটের কোথাও শুয়ে আরাম পাইনে—

হুইসল রাজবংশের রানীর ঠিক নেই। সব এক ধরনের নাম। কে যে কার রানী তা গুলিয়ে যাবার যোগাড়। তাই শরদিন্দু ঘোষাল টেবিল থেকে নথি নিয়ে বসলেন।

দস্তিদার-শিকদার-সরদার মামলা।

রেল স্টেশনের ফড়েদের কাছে শসা বেচে ফিরছিল সুবালা সরদার। সুশীল সরদার তখন মিষ্টির দোকানে। আসামী পক্ষের

উকিল পরিষ্কার বলেছে—সুশীল তার বউ সুবালাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলতো। ভিয়েন বসবে বলে সন্ধ্যে রাতে দোকানে চলে আসতো। ফিরতো দিনে দিনে। ঘুম কাতুরে মানুষ। রাত জেগে জেগে ঘুমোবার জন্যে দিনকে রাত করে নিয়েছিলো। বিয়ে তা আট বছর পেরিয়ে গেছে। বাচ্চাকাচ্চার দেখা নেই। সাক্ষী ডাকতে হয়নি। জেরার জবাবে সুশীল নিজেই কবুল করেছে—ছোটো ঘর। বারান্দায় চ্যাটাই ঘেরা আড়ালে ঘুম দিয়ে নি রোজ।

শীতকালে ?

ঘেরা জায়গা তো। খড় দিয়ে ঘিরে ফেলি চাটটি চাটটি করে।

সরকার পক্ষের উকিল আসামী পক্ষের উকিলের জেরার আপত্তি তুলে ছিলেন। বিশেষ করে তার ইঙ্গিতে। প্রশ্রয়ের হাসি সুবালা ছাড়া কে হাসতে পারে ? এই ছিল আসামী পক্ষের উকিলের সওয়ালের শুরুতে।

সরকারী উকিল বলেন, কোন নারী একই সঙ্গে দুজনকে প্রশ্রয় দিতে পারে না।

তখনই শুরু হয়ে যায় নারী চরিত্র নিয়ে দীর্ঘ বিশ্লেষণ। শেক্সপীয়র থেকে সংস্কৃত কবিরা—কেউ বাদ যাননি। এজলাসে বসে শরদিন্দু মুখ গোমড়া করে সবই শুনেছেন। ভালোই লেগেছে শুনতে। নারী নাকি একই সঙ্গে একাধিক পুরুষকে কামনা করতে পারে। পারে একাধিককে উদ্দীপ্ত করতে। হেলেন কত জাহাজ ভাসিয়েছিল ?

নথি দেখছিলেন আর মনে মনে হাসছিলেন শরদিন্দু ঘোষাল। হাতঘড়িতে বেলা সাড়ে তিনটে।

মাথার মধ্যে তখন রীতিমত ডিবেট শুরু হয়ে গেল।

সরকারী উকিল : প্রশ্রয় যদি থাকতো—তাহলে খুন হোল কেন ? দু'দিকের কনসেণ্ট থাকলে খুন হয় কখনো ?

খুন তো ওরা করেনি। হয়তো সাঁতার জানতো না।

তাই ডুবে গিয়ে মরে ভেসে উঠেছে। গাঁয়ের পুকুরে সাঁতার কেটে সুবালা বড় হয়েছে। দারোয়া নদীতে এতটুকুন বয়স থেকে কে সাঁতার কাটতো ?

খুন যদি হয়েও থাকে—সে খুন আমার মক্কেলদের কাজের ভেতর পড়ছে না। ভাইড্ সেকসন অমুক—টু বি রেড্ উইথ সেকসন অমুক ক্লজ তমুক.....'এ'.....

রেপ কেসের পরেই অন্য একজন বা একাধিক এসে পড়লো—এবং তারা খুন করে চলে গেল !

তা সুবালা যে ক্যারেকটারের মেয়ে ছিল—সে তো আরও পুরুষমানুষকে আহ্বান জানাতে পারে—

বলুন, আবার প্রশ্রয়ের হাসি হেসেছিল সুবালা !

নাও হাসতে পারে। হয়তো ইচ্ছের বিরুদ্ধে ব্যাপারটা হয়ে থাকতে পারে। তারই জের হিসেবে জলে ডুবে মরার চেষ্টা—

সরকারী উকিল মুখের কথাটা লুফে নিলেন। সাঁতার জানা লোক কখনো জলে ডুবে মরতে যায় ? তাও কোন নদী নয়। পাগলা চণ্ডীর বিলে ? যাতে কোন ঢেউ নেই।

হয়তো খুনই হয়েছে।

আলবৎ হয়েছে। খুন করে ঝামা ইটের চাঙ পায়ে বেঁধে সুবালাকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। সুবালা হয়তো চেঁচিয়েছিল। হয়তো বাধা দিয়েছিল। লোকলজ্জা, ভয়, সম্মান, টেনশন—সবকিছুর চাপে পড়ে কত মানুষ এই সময় খুন করে বসে। কেননা, সম্ভোগ বাসনা আর নিশ্চিহ্ন করার ইচ্ছের ভেতর কোন মিল থাকতে পারে না। দুটো আলাদা ব্যাপার। ভয়, সম্মানের ভয়, পাছে বলে দেয়—এই টেনশনে ভুগে পুরুষমানুষ খুন করে বসে—তার একটু আগের কামনা বাসনার মেয়েটিকে। তার এই খুনের সঙ্গে মিশে যায় খানিক আগের অসম্পূর্ণ সঙ্গমের বিষাদ, আশাভঙ্গ !

একাই সওয়াল জবাব করে শরদিন্দু তার মাথার ভেতরে এমন

একটা জায়গায় এসে পৌঁছোলেন—যেখান থেকে তার মন ও চোখের অভ্যাস বলে দিলো—এবার ছায়া পড়বে।

পাগলা চণ্ডীর বিলবাঁধের গায়ে অঢেল সারি জমি। সেখানে বুনো কচু, ওল চারার ডাঁটো ডগায় ডগায় এলোপাথাড়ি জঙ্গল। খানিকটা ভেলভেট ঘাস। হাঁটলে জাজিম মনে হবে পায়ের নিচে। সরকারী উকিল তাই বলেছিলেন। সেখানেই দস্তিদার শিকদার মিলে সরদারকে পেড়ে ফেলে। হরতালের বাজার। চাদ্দিক শুনশান। সুবালা বাধা দিয়েছিল নিশ্চয়। সে একজন ঘরের বৌ। নাই বা সুনীল সরদার তার সঙ্গে রাত কাটালো। স্বামীর ডিউটি স্বামী না করলে—সে বউ হয়ে আগ বাড়িয়ে সংসার-খেলাপি তো করতে পারে না।

হয়তো চেঁচিয়েছিল। দু'হাত দিয়ে বাধা দিয়েছিল। একজন পা চেপে ধরে রেখেছিল। অন্যজন তখন। এইভাবে বদলাবদলি করে। সেই সময় হাতের চুড়ি ভেঙে গিয়ে ঘাসে মিশে যায়। তারপর এক সময় দস্তিদারের থলে থেকে জাল টিকিটের বাণ্ডিল গিয়ে পড়ে কচুবনে। দস্তিদার কি খালি গা হয়ে গিয়েছিল? শিকদার নিশ্চয়। নয়তো ফটো সমেত ওভাবে কারও মানিব্যাগ পড়ে থাকে।

এর চেয়ে বড় এভিডেন্স আর কি থাকতে পারে! ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়েছে ব্যাপারটা। কিন্তু পিঠে পুরুষ-নখের দাগ জলে ভিজে মুছে গেছে।

রেপ অস্বীকারের রাস্তা নেই। অন্য এভিডেন্স বলে দিচ্ছে, ধর্ষণের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ওরা খুন করেছে। তারপর বডি লোপাটের চেষ্টা। পুরো ব্যাপারটা ঘটেছে মোট ২৭ মিনিটে।

নিতাই দস্তিদার মসলন্দপুর—চাঁদপাড়া ৮৪ নম্বর বাসরুটের ঘাঘু টাইমকিপার। এমনভাবে বাসের অ্যারাইভাল ডিপারচার লিখে যেতে পারে—যাতে কিনা—কোন ড্রাইভারই ফাইন না দিয়ে ডেইলি কমিশন পুরো তুলতে পারে। ড্রাইভার মনোরঞ্জন শিকদার আগে ছিল আমতলা-ঘটকপুকুর ৯৬ নম্বর রুটে। প্রথমে চাপা দেয় ছাগল।

তারপর এক খুকী। রুট পালটে এই ৮৪ নম্বরে শিকদার চলে এসেছে সাত বৎসর হয়ে গেল। পাকা ড্রাইভার। ওরা এমন কাঁচা কাজ করলো কী করে।

নথির ফ্ল্যাপ মুড়ে বেঁধে ফেললেন শরদিন্দু ঘোষাল। অমন হয়ে যায় মানুষের। বিচারপতি হয়ে আমিও কি রানীকে জড়িয়ে ধরিনি পাশ থেকে। রানী পিছলে পেরিয়ে গেল।

গুরুসদয় দত্ত রোডের গাছগুলোর বয়স অনেক। সেনা ব্যারাক, নতুন ফ্ল্যাটবাড়ি, অফিস, ক্লাবের মাঠ। এ সব জায়গারটা জায়গায় রেখে রানী রোজ পোড়ো সাহেববাগানে তের নম্বরে ফিরে আসে। তার বড় খুকীর বয়স নয়। বাকি তিনটি খোকা। সাত, পাঁচ, চার। সি এম ডি এ আলো দিয়েছে—পাকা পায়খানা দিয়েছে এদানী। সেই সঙ্গে ১২ ফুট চওড়া বাঁধানো রাস্তা। তিনশো ফুটের দু'টি টিউকল।

আজ ১৭ মে। গরমের ভাপ একদম নেই। রোজ খানিকক্ষণ বৃষ্টি হচ্ছে কলকাতায়। বেলা বারোটা। রানী বাজার করে ফেরে শরদিন্দুদের বাড়ি থেকে ফেরার পথে। জগাই মিস্ত্রী কাজে না বেরোলে চাল ফুটিয়ে ভাত নামিয়ে রাখে। আগের দিনের কেনা কুটনো কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যাহোক কিছু একটা চাপিয়ে দেয়। কাঠের গুঁড়ো, চোকলা, টুকরোটাকরা তো জগাই নিজে এনে জমা করে রাখে। জ্বালানীর ভাবনা রানীর নেই। মিস্ত্রী কাজে বেরিয়ে গেলে বড় খুকী ভাতটা অন্তত ফুটিয়ে রাখে। রানী এসে কুটনো বসায়।

বাজারের থলে নামিয়ে রেখে ঘরে ঢুকতেই অবাক হোল রানী। এ কি? কাজে যাওনি মিস্ত্রী?

তের নম্বরে জগাই মিস্ত্রী সবার সমীহ পায়। তার রোজ ১৬ টাকা। কেউ ডাকে মিস্ত্রীমশায়। কেউ জগাইদা।

যাবো কি। ছোটো খোকা পড়ে গেল—

ধড়াস করে উঠলো রানীর বুক। কোথায় ?

ওই তো শুয়ে আছে।

রোদ থেকে এলে ঘরের ভেতরটা পরিষ্কার দেখা যায় না খানিকক্ষণ। চোখ সয়ে এলে তবে সব পরিষ্কার হয়। ভেতরে গিয়ে দেখে সবেধন চৌকির ওপর ছোটো খোকা শুয়ে। বড় খুকী মাথায় জলপটি দিচ্ছিল।

ও মা! বলে কোলে নিতে যাচ্ছিল রানী। বাকি দুই খোকা মেঝেয় বসে—একজন সাত—অন্য জন পাঁচ—একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো। হনুমান এইচিল মা—

বড় খুকী বয়স আন্দাজে অনেক বুড়ী। সে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে মাকে শব্দ করতে বারণ করলো। এখন ঘুমুচ্ছে একটু—জাগলে কোলে নিও।

কি হয়েছে আমায় বল না—। রানীর সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। জগাইর যখন উনিশ বিশ—তখন সে পাঁচ বছরের বউটি হয়ে তের নম্বরে এসেছিল। আগে মিস্ত্রীকে তার বাপ বাপ লাগতো। এদানী মিস্ত্রী তার বরের মত হয়ে উঠেছে। এর ভেতর চার খোকা-খুকীর মা হয়ে বসে আছে রানী। আগে তো মিস্ত্রী তাকে পদ্মপুকুরে মেলায় নিয়ে গিয়ে পুতুলও কিনে দিয়েছে। সেসব অনেক দিনের কথা। এখন সে তের নম্বরের লাইন বন্দী ঘরগুলোর গন্ধ অব্দি চেনে। কোন ঘরে থাকে সেপাইজী। কোন ঘরে ঝাড়ুফুকের মাদারি। কোনোটায় বা হাফগেরস্থ—সন্ধ্যে হলেই আলতা ঘষে বেরিয়ে পড়বে—সেই সদর রাস্তায় গিয়ে পাক খাবে—ক্লাবের মাঠ পেরিয়ে। কিন্তু মিস্ত্রীর কথায়—বড় খুকীর কথায় তার ভয় ধরে গেল। সে যেন অন্যের কোন সংসারে বেড়াতে এসে জানা পরিচিতদের অসুখ-বিসুখের খবর নিচ্ছে।

বাপ মায়ের দেখা নেই তো। রানী ফেরে সেই বারোটায়।

আবার বেরিয়ে যায় বেলা পাঁচটায়। জগাইয়ের কাজ পড়লে ভোরে বেরিয়ে সেই রাত হয়ে যায় এক একদিন। তখন বড় খুকীই সারাটা সংসার সামলায়। তিন তিনটে ন্যাংটো ভাইয়ের হিল্লে রাখা—সে কি সহজ কাজ।

বড় খুকী বললো, হনুমান এসেছিল। এই অ্যাতো বড়।

ধমকে উঠলো রানী। ক'বার বলবি এক কতা। তারপর কি হোল? জলপট্টি কেন? জ্বর? কি করে?

মিস্ত্রী বারান্দা থেকে চেঁচিয়ে বললো, বড়রা সবাই দেখতে গেছে। তাই না দেখে ছোটো খোকা কখন উঠোনে নেমেছে—কেউ লক্ষ্য করেনি।

তারপর? আর সহ্য করতে পারছিল না রানী। এই ছোটো খোকার চেহারাটি তার বাকি ছেলেমেয়ের চেয়ে কিছু আলাদা। জজবাড়ির মাইনে মোটা। হালকা কাজ। সেই কাজের পয়সা থেকে আলাদা করে দুধ রাখে ওর জন্যে। অন্য তিনটে দুধের বয়স পেরোবার আগেই দুধ ছেড়ে দেয়। রানীর বুকে তখন বিশেষ দুধ হোত না। পয়সাও আসতো না। এলেও দাঁড়াতো না। এই খোকাটিকে সে একদম গোড়া থেকে নিজের মনের মত করে বড় করতে চায়।

হনুমান ফিরে দাঁড়িয়ে তাড়া দিতেই বড়রা দৌড়ায়। সে-ভিড়ে ছোটো খোকা ধাক্কা লেগে পড়ে গেল।

কেটে গেছে?

না। ছড়ে গেছে। কিন্তু হনুমানটা একদম ওর সামনে এসে ভেঙচি কাটায় ভয় পেয়েছে ছোটো খোকা। অত বড় হনুমান তো।

রানী তার বাজারের থলে বারান্দায় ছড়িয়ে দিল। আঃ। তারপর কি হোল বল না। জ্বর কত? ভয় পেয়ে মরে যাবে না তো?

জগাই মিস্ত্রী রানীকে বিয়ে করে এনেছিল খুকীটি। রাতে কাঁথা পালটেও দিতে হোত তার। যৌবন বয়সে বউয়ের হ্যাঁপা অনেক পোহাতে হয়েছে জগাইকে। ঠাকুর দেখানো। মেলায় নিয়ে যাওয়া।

তখন ছিল অনেকটা বাপের মত। এখন সে স্বামী। র‍্যাঁদা টেনে করাত চালিয়ে গায়ে গতরে এখন সে ক্লান্ত থাকে। সে ভার খানিকটা কমিয়ে দেয় রানী। ডাগরটি হয়ে উঠতেই জগাইয়ের সংসার সে হই-হই করে চালু রেখেছে। কিন্তু এমন তো কোনোদিন করে না। অ্যাই! বলে ধমকে উঠলো জগাই মিস্ত্রী। দিলি সব ছড়িয়ে। ভয় পেয়ে জ্বর হয়েছে। তাতে অত ভয় পাবার কি হয়েছে? যা। বেগুন দুটো তোল। আজ ভাজবো নি। আলুভাজা করে রেখেচি। আর হনুমানও বলিহারি। কোন গাছে ফল নেই—তবু আসা চাই।

ঘরের ভেতর থেকে ছেলেদের মধ্যে বড়টা চেঁচিয়ে বলল, ওরা পাতা খায় বাবা। আমার চেয়ে লম্বা। লাল পাছা বাবা—

চুপ কর। কোন কাজে আসে না। শুধু কাড়ি কাড়ি খাবে। যা আগুনটা উসকে দে—

ধমক খেয়ে বড় ছেলে পাকা রাঁধুনির মত নতুন এক টুকরো কাঠ গুঁজে দিল চুলোয়। সবই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল রানী। তার চোখে জল। ছোট খোকার কাছে গিয়ে ভিজে কপালে গাল ঠেকাতেও ভয় পাচ্ছিল। না জানি কত জ্বর। এ ছেলে সে চোখে চোখে রাখে। আবার চোখেই হারায়। বাবুদের বাড়ির ছেলেপেলের মতই মুখখানা খুব সুন্দর ঠেকে তার চোখে। আধো আধো কথা বলে এখনো। গালটা টোপা টোপা। একদম ছ্যাচা স্বাস্থ্য। হনুমান এসে এ কি করে গেল!

খানিক আগেও রানী গুরুসদয় দত্ত রোডে জজবাড়ির ঘরের কাজ করছিল। সেখানে বৌদিমণির ঘরসংসারের রাখালী করে এসে এখন নিজের বড়খোকাকে আগুন ওসকাতে দেখে সবই কেমন খেলনা খেলনা লাগছে রানীর।

কিন্তু এটা তো আসলে তার নিজেরই সংসার। সেই পাঁচ বছর বয়স থেকে গড়ে পিটে তোলা—একদম নিজের সংসার রানীর। চুপচাপ ছড়ানো বেগুন তুললো। তুললো এক জোড়া বড় তেলাপিয়া।

ভেবেছিল, প্যাঁজ রসুনে ভেজে নিয়ে আচ্ছা করে ঝাল বানাবে। সে-সব রইলো পড়ে। রান্না ভুলে গিয়ে রানী ঘুমন্ত ছেলের কপালে গাল চেপে ধরলো। নাঃ। জ্বর নেই বিশেষ। ইজেরের বাইরে হাঁটুর ওপর থেকে বাঁ পায়ে কোমর অব্দি কালশিটের দাগ। সেখানেও গাল চেপে ধরলো রানী।

বড়খুকী ছুটি এসে ইঙ্গিতে বলল, উঠে এসো মা। ঘুম ভেঙে যাবে—

আর ন্যাকামো করবি তো এক চড় কষাবো। ইদিকে আয়—কোথায় কেটেছে দেখা—

ঘুমের ভেতর ছোট খোকা পাশ ফিরলো।

দিয়ে থুয়ে নিজের খেতে খেতে প্রায় তিনটে হয়ে গেল রানীর। জগাই মিস্ত্রী তার র‍্যাঁদার বাটালি খুলে নিয়ে জলে ভিজে শান পাথরে শানাচ্ছিল। চল্লিশের কাছাকাছি দাড়িতে, চুলে লোমে ঢাকা জোরালো মানুষ। রানী জানে, এই পুরুষমানুষটার ভেতরে সে নিজে বিরাট এক চাঙ বরফ হয়ে রোজ একটু একটু করে গলে, কমে আর ক্ষয় হয়। তাতেই সব কাজে আরাম পায় মিস্ত্রীমশায়। আহ্লাদ হয়—আমেজ হয় জগাই মিস্ত্রীর। খেতে খেতেই রানী বুঝলো, গড়িয়াহাট বাজারে চালানী মাছের কাঠের বাক্স হাতুড়ি ঠুকে খোলার পর বিশ ত্রিশ কিলোর পোনা মাছ সাজিয়ে রাখতে যে সব বরফ চাঙ লোহার আংটা দিয়ে ঠেলে আনে—সে নিজেও যেন তারই এক চাং। মিস্ত্রীমশাই তার সঙ্গে শীতল থাকেন। অল্প বয়সে রানী তার বড়োসড়ো বরকে আপনি আপনি বলতো। বড় খুকী পেটে এলে পর তুমিতে নামে।

র‍্যাঁদার ইস্পাতফলা জিভখানা শান দিতে দিতে রানীর দিকে তাকালো। কাল একবার ও বাড়ি থেকে সকাল সকাল আসবি তো। ছোটো খোকাকে একবার দেখিয়ে আনবি। বাঁ পা টানলেই ট্যাঁ অ্যাঁ করে।

তোমায় বৌদিদিমণি একবার যেতে বলেছে। শোবার খাটের যেন কি করবে—

আমার মজুরি বলেছিস তো?

সে বলা লাগবে না। যেওনা তুমি।

পরিষ্কার বলে নেওয়া ভাল। দিন বিশ টাকা। করাত ধরলেই দিন কুড়ি টাকা ধরে দিতে হবে।

কত কুড়ি টাকা পাও তুমি! সে আর আমি জানিনে।

দশ বারো তলায় থাকে। কুড়িটা টাকা দেবে না? এক তলার বাসিন্দে হলে আমার দিন ন্যায্য ষোলো টাকাই চাইতাম। হাতের কাজ বলে কথা।

খেতে খেতে রানী তার মিস্ত্রীকে দেখছিল। যে মিস্ত্রী অনেক রাতে তাকে পরিষ্কার বলে—এখনো তো সেই বড় খুকীটি আছিস দেখছি। নে—ঠিক করে শো।

রানীর আরও লক্ষ্য পড়লো, র‍্যাঁদার ইস্পাত-জিভ শানানো মিস্ত্রী মশায়ের শরীরের প্রায় সবটাই খোলা। অথচ জজবাড়ির দাদাবাবু এর প্রায় সবটাই ঢেকে ঢুকে রাখেন—পাজামা, পাঞ্জাবি, স্যাণ্ডেলে দু'টো পুরুষ দু'রকমের।

সেই কথাটা পেড়েছিলি?

খাওয়া থেমে গেল রানীর। না। ও আমি বলতে পারবো না।

বোকামো করিসনি। কেচ্ছাটা পুরনো হয়ে গেলে পস্তাবি বলে দিলাম রানী।

আমায় দিয়ে হবে না মিস্ত্রী। ওরা আমায় খুব ভালবাসেন। আমি কি করে বলবো ও কথা—

তোকেই তো বলতে হবে। বৌদিদিমণি যখন থাকবে না—তখন। পরিষ্কার বলবি দাদাবাবুকে—টাকা দিন। নয়তো সারা পাড়ায় চাউর করে দেবো—দশতলার ভদ্দরলোক হয়ে আমাদের মত কাজের মেয়েমাগীকে জড়িয়ে ধরার লোভ হয় মাঝে মাঝে—

জড়াতে গিয়েছিল। জড়িয়ে তো ধরেনি।

ওই একই কথা হোল রানা! এখানে আসল কথাটা হোল গিয়ে বড় বাড়ির কেচ্ছা। কেচ্ছা কে না শুনতে ভালবাসে? কেচ্ছা কে না ভয় পায়?

তাই বলে মিছিমিছি ভয় দেখিয়ে টাকা নোব? পুরুষমানুষের অমন একটু আধটু হয়ে যায়। সব কি ধরতে আছে মিস্ত্রী? অমন হয়েও যায়—ভুলেও যায় লোকে। তোমার কত কি আমি ভুলিনি মিস্ত্রী?

ধরার যেটা ধরতে হবে বৈকি। মাসে মাসে পঞ্চাশ ষাট টাকা করে নিবি। গায়েও লাগবে না দাদাবাবুর। কুকুর পুষলে ওরা তার পেছনেও মাসকাবারি তিন চারশো টাকা ওড়ায়। মাংসের—পাউডারের—আমি দেখিনি? কত বড় বড় বাড়িতে আমি কাঠের কাজ করেছি না? ওষুধই খাওয়ায় সত্তর আশি টাকার। আর সেখানে তুই পঞ্চাশ ষাট টাকার মাসকাবারি কারবার করতে পারবিনি? আমি তোর স্বামী হয়ে বলছি—

তোমায় সব খুলে বলাই ঘাট হয়েছে আমার মিস্ত্রী। অত ভাল লোক ওরা—

চেপে যেতিস! তাহলে গরল বেরোতো গা দিয়ে। স্বভাব খারাপ হয়ে যেতো তোর রানী। নির্ঘাত খারাপ পথে পা বাড়াতিস। আর আমি তোর মিস্ত্রী। আমায় না তো কাকে বলবি? এত সুন্দর ব্যাপার হয়ে গেল। এখন তা থেকে মাসকাবারি ফায়দা ওঠা। বিনি খাটুনির ফায়দা। গায়ে গতরে তো কিছুই করতে হচ্ছে না তোকে রানী। কি বলিস?

কোন কথা না বলে রানী চুপ করে তার মিস্ত্রীকে দেখছিল। সে তো সত্যিই চুল ভ্রূ, গোঁফ-দাড়ি. লোমে ঢাকা—খানিক খানিক খালি-গা এই মানুষটার হাতে তৈরি স্রেফ কাঠের একখানা বারকোশ মাত্র।

নে। আঁচিয়ে নে। বিকেল হয়ে যাচ্ছে না—। হাত শুকিয়ে গেল যে।

২৩শে মে। আজ বছরের সবচেয়ে গরম দিন। এখন পর্যন্ত ১০২ ডিগ্রি ফারেনহাইট। ল্যাংড়া বাজারে পড়তে পারছে না। কিছু গাছপাকা আসে গড়িয়াহাটায়। বাঁধা ঘরে সেসব চালান হয়ে যায়। তারই দু'ঝুড়ি এসেছে গুরুসদয় রোডে। এ বাড়ির দশ তলায় শরদিন্দু ঘোষাল আকাশে ঝুলন্ত ব্যালকনির একধারে বসে ফ্রিজঠাণ্ডা ল্যাংড়ার একটি পিঠ চামচে কুরে কুরে খাচ্ছিলেন আর পৃথিবীকে দেখছিলেন। বিকেলবেলা। নিচের ধুলো এতদূর ওঠে না। সুন্দর স্বাস্থ্যের সব বড় বড় গাছ বাতাসে গা ধুয়ে নিচ্ছিল।

আজও দুপুর থেকে ইতিহাস পড়ায় শরদিন্দুর গালে-চোখের পর্দায় দ্যুতি আর লাবণ্য থকথক করছিল। হয়সল রাজবংশ দ্বারসমুদ্রের পলি উপত্যকায় ভাল ফসল ফলাতো। বাঙালী মেয়েদের ধরে এনে রানী বানাতো। নরবলি ছিল। ছিল ওদের নিজেদের প্রহসন। নাটক। তামাশা। সভ্যতা।

জালালুদ্দিন খলজি দ্বারসমুদ্র নিয়ে অতটা মাথা ঘামায়নি। কিন্তু আলাউদ্দিন সে পাত্তর ছিলেন না। চতুর্দশ শতাব্দীর শুরুতেই তিনি কমলাদেবীকে পোষ মানালেন। মহিষী কমলা ছিল তার অ্যাসেট। তারপর মালিক কাফুর হলেন তার সেনাপতি। এমন বৌ—এমন সেনাপতি—মনের ভেতরকার আকাঙ্ক্ষা একটা লোককে কতদূর তুলে দিতে পারে। সুখী হয়সল রাজারা ভাবতে পারেননি—তাদের মহিষীরাও একে একে কোট পাল্টাবেন। পরাজিত মোঙ্গলরা তখন সবে নব মুসলমান! মহামান্য বিচারপতির ধ্যানধারণা চিন্তাভাবনা এখানে এসে বাধা পেল। ল্যাংড়ার তিনটি মাংসল আঁটি নিয়ে পড়লেন। চামচে একাজ হয় না।

এবার মনসুন আসছে ৭ জুন। আকাশে—গরমের ভাপে তার আয়োজন। বঙ্গোপসাগরের অকূল দরিয়ার কোন আকাশে কলকাতার জন্যে ঠিক এখন চামচ মেপে বায়ু চাপ, গরম, জলকাদা মিশিয়ে বর্ষণ রান্না করা হচ্ছে। সে বর্ষা ছুটে এসে কলকাতাকে ধুয়ে ফেলবে। শহরের বাইরের মাঠ ভিজিয়ে কেঁচো, কেন্নো তুলে জমিকে করবে সারবান।

কিন্তু টেনথ্ ফ্লোরের জানালায় দাঁড়িয়ে নীপা জগাই মিস্ত্রীকে খাটের নিচে পাঠিয়ে দিয়ে আকাশ কিংবা বর্ষার কথা ভাবতে পারেনি। মনেও আসেনি। বরং একজন কাঠের মিস্ত্রীর ফতুয়া ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা শরীর, খাটের তলা থেকে বেরোনো পায়ের কাছ মাসল যে এতখানি মনোহারী হতে পারে—হাইকোর্টের বিচারপতির স্ত্রী হিসাবে আগে তার আদৌ জানা ছিল না। সে অনেকদিন ঠিক এভাবে বলশালী পুরুষের খোলা শরীর দেখেনি। তাতে লোমের জায়গায় লোম। কাঁধের দু'দিকে দুখানা হাড় চ্যাটালো হয়ে বাহুমূলে চলে গেছে। এক মাথা জঙ্গুলে কালো চুল। গোঁফ দাড়ির ভেতর দিয়ে দু'টো সাদা মুরগির ডিম চোখ—সামান্য লালচে—ঘন ঘন, বৌদি এবার কি করতে হবে বলুন—সব মিলিয়ে দিব্যি আমোদ হচ্ছিল নীপার।

এ লোকটা উকিল নয়। ব্যারিস্টার নয়। শরদিন্দু নয়। আসামী নয়। পীরেন নয়। অথচ দিব্যি র‍্যাঁদা চালিয়ে সকাল থেকে কাঠের গায়ের চোকলা তুলে ফেলছে—বুকর‍্যাক খান খান করে দেওয়ালে লাগিয়ে দিচ্ছে—একদম দাগ থাকছে না। দিব্যি ঘামে। বৌদিদি—এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল দেবেন তো বলে সে ফ্রিজের বরফ ঠাণ্ডা এক গ্লাস চোঁ করে মেরে দিচ্ছে। এসব জিনিস অনেকদিন পায়নি নীপা।

যাবার সময় রানী বলে গেছে, আমি চললুম বৌদি। ছোট খোকাকে একবার কবিরাজ মশাইকে দেখাবো। হাঁটতে পারছে না। পা পেতে এগোতে গেলেই পড়ে যায়। সেই ছড়ে যাওয়া জায়গাটার ভেতর যে কি হয়েছে—

কি হয়েছে রে রানী ?

মাংস দিয়ে ঢাকা তো। বাইরে থেকে দেখা যায় না।

এক্সরে করা।

এই বেলা করাতে হবে বৌদি।

তোর স্বামীকে নিয়ে যা—

পয়সা দিয়ে দেবেন। আশপাশে খেয়ে দেয়ে আবার কাজে লাগবে বেলাবেলি।

দাদাবাবু খেয়ে নিয়ে পড়তে বসলেন। আমি তো এখনো খাইনি।

বেড়ে দিয়ে যাবো বৌদি ?

নাঃ। আমি নিয়ে নেব। তোর মিস্ত্রীকে কিন্তু ফেলে গেলি।

দিন মজুরীর কাজে তো এমন বাইরে বাইরেই যায়।

এখন বিকেলবেলা। খাটের তলাটা বোঝাতে নীপা খাটের নীচেই চলে গেল। তার দামী কোমর থেকে ফাইন এক ঢেউ জগাই মিস্ত্রীর কোমরের কাছাকাছি গিয়ে মেঝেতে শোয়ানো শরীর নিয়ে নীপা বুঝিয়ে বলতে গেল—খাটের কোন জায়গাটায় শুয়ে সে বিশেষ আনন্দ পায় না। কাঠের কাঠ। কিন্তু কাঠগুলো রীতিমত ষড়যন্ত্রী। পাশ ফিরলে উনিশ বিশ নেই।

রঙীন শাড়ি ব্লাউজে ঢাকা সুগন্ধী এমন লালচে মাখন শরীর জগাই মিস্ত্রীর এত কাছাকাছি আসেনি কোনদিন। সে কোনরকমে একবার বললো, খাটের এই আড়াটা একটু নামিয়ে দিই ? মাঝের প্লাইটা চেঁছে—

সে তুমি যা ভালো বোঝো কর মিস্ত্রী। গরমকালটা আমার খুব কষ্ট হয় শরীরে। শুয়ে আরাম নেই।

জগাই মিস্ত্রী মনে মনে নিজেকে ধন্যবাদ দিল। ভাগ্যিস খাকির লং প্যান্টটা না পরে লুঙ্গি আর ফতুয়ায় চলে এসেছিল। নাহলে লজ্জার শেষ থাকতো না। পুরুষের শরীর—সব জায়গা তো মাথার কথা শোনে না।

বিড়ি ঘাম—সেই সঙ্গে র‍্যাঁদার ঘষটানিতে চোকলা ওঠা কাঠ থেকে পুরানো গাছের বুকের ভেতরের আদি গন্ধ মিশে যাচ্ছিল। নীপা ঝ্যাল-ঝ্যালে লুঙ্গির ভেতর থেকে একটা গাছের পুরু মাঝবয়সী কাণ্ড দেখতে পেল—যাকে রানী হলে বলতো—ও তো মিস্ত্রী মশায়ের উরুত বৌদিমণি। কাকে তুমি গাছের গুঁড়ি বলছো গো। খাটুনির শরীর তো। সেই সঙ্গে একটা একটা করে ভাত চিবিয়ে খায়। সব হজম। তাই খানিক গাট্টাগোট্টা।

এর পরের দৃশ্য তিরিশ মিনিট পরে।

বিকেলের গা ধুতে কলঘরে ঢুকে আইভরি সাবানে বরফ ঠাণ্ডা জলে সারা শরীর ম ম করে তুললো নীপা।

আকাশী তোয়ালে তাকে সবটা পায় না। সেই অবস্থাতেই কোন মতে গা ঢেকে খটাস করে কলঘরের দরজা খুলে দিল। তারপর জোরে আদেশের সুরে তাকলো, বুঝলে মিস্ত্রী—এই পেতলের ছিটকিনিটা ওপরে তুলে দাও। এদিকে এসো।

জগাই মিস্ত্রীর তখন চরকি লাগা ঘোর-খাওয়া দশা। ঘন কালো দাড়ি গোঁফের জঙ্গলে মুরগির ডিম দুটো লাল হয়ে উঠেছে। সারাদিন খালি পেটে এটা চেঁছেছে। ওটার বাটাম মেরেছে। সেটার গায়ে র‍্যাঁদা চালিয়ে ঢাল বের করেছে—থাক রেখেছে।

জগাই কলঘরে দরজার ওপিঠে যেতেই বোঝাবার সুবিধের জন্যে নীপা দরজাটা আটকে নিয়ে একদম কাছাকাছি এসে গেল। দুএকবার নীপার ঠাণ্ডা শরীর জগাইর গা ঘেঁষে লেগেও গেল। সে সব সময় মিস্ত্রীর ছ্যাঁকা খাওয়ার দশা। ঠাণ্ডার ছ্যাঁকা। সুগন্ধী ছ্যাঁকা।

এই তো কাজ মোটে মিস্ত্রী। সারাদিন ছায়ায় ছায়ায় খুটখাট চালানো। আমি তোমায় মজুরি দিতে পারবো না! মিস্ত্রীর মনে হোল—এসব কথা কোন নতুন কায়দার। গেরস্থবাড়ির মা মেয়ে-ছেলেরা তো এভাবে কথা বলেন না। সে কি একবার চেপেচুপে ধরে দেখবে। না, সে সব করলে যদি ভুল ভাল হয়ে যায়। কিন্তু শরীরের

ভেতরটা এক এক সময় এমন এক এক দিকে ঝোঁক নিচ্ছে। বৌদিমণি হাসছে না ধমকাচ্ছে—বুঝে উঠতে পারলো না জগাই। আন্দাজে বললো, সে আপনার যেমন ইচ্ছে। রানী তো আপনার খুব সুখ্যাতি করে।

রানীর কাজের সঙ্গে নিজের কাজ গুলিয়ে ফেলো না মিস্ত্রী। বলতে বলতে নীপা জগাইয়ের কাঁধে হাত রাখলো!

জগাই সরে যেতে গিয়ে দেখলো, আর পিছোবার জায়গাই নেই কলঘরে। সুন্দর গন্ধ দিয়ে ভরা জায়গাটা। মাড়োয়ারিদের ঠাকুর-ঘরের মতই সাজানো গোছানো। দেওয়ালের পিঠ দেওয়া জঙ্গী বেড়াল হয়ে গেল জগাই। আপনি কি চান আমার কাছে? কাঠের কাজ? না—

তোয়ালে শক্ত করে টেনে নিলো কোমরে—তারপর নীপা হাসি আর ধমক একসঙ্গে করে বললো, কেন? হাতের কাজ করতে এসেছো এখানে! ছিটকানিটা লাগাও তো ঠিক করে। আমি তৈরী হয়ে আসছি।

জায়গা পালটে স্ক্রুপ লাগাবার লাগসই পয়েন্ট বেছে জগাই মিস্ত্রী তুরপুনের দাঁত বসালো কাঠে তারপর সুতুলি তুরপুনের কপিকলের জায়গায় চাপ দিল।

॥ ৪ ॥

৯ জুন। কোর্টের ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোতে বর্ষণ।

উপর্যুপরি ধর্ষণ। খুন। তারপর প্রমাণ লোপাটের জন্য লাশ গুম করার ব্যবস্থা। পেনাল কোডের নানান ব্যাখ্যা হয়। কিন্তু একটা গলিও পাওয়া যাচ্ছে না—যেখান থেকে নিতাই দস্তিদার আর মনোরঞ্জন শিকদার গলে বেরিয়ে আসতে পারে।

অথচ জাস্টিস শরদিন্দু ঘোষাল পরিষ্কার বুঝতে পারছেন, পুরো কাণ্ডটার মূলে রয়েছে—এক মুহূর্তের রঙীন কল্পনা। না জানি এই শরীর উদোম হলে কোথায় কোন্ খাঁজে খানিক করে রহস্য, না-দেখা জগৎ, লাবণ্য, সুখ লেগে আছে দেখা যাবে।

নয়তো মানুষেরই তো শরীর। হাওয়া পাম্প করা একটা বড় পুতুল। খানিকক্ষণ দখলের স্বাদ পাওয়া। ভেতরে প্রাণবায়ু, প্রতিদান, মিথ্যে রহস্য গুঁজে দেওয়া থাকে। একসঙ্গে বসবাসে সুবিধার জন্যে কয়েকটা শর্ত মেনে চলার ব্যবস্থা থাকে। যেমন—যার বউ—তারই বউ। একধরনের সম্পত্তি সম্পত্তি ভাব। অথচ সব প্রপার্টিই তো আসলে রবারি। কারটা কার হওয়ার কথা ছিল। কিংবা কেউ তো আসলে কারও না।

নীপার আমি নই। আমার নীপা নয়। কলঘরে জগাইকে সে স্বচ্ছন্দে ডাকতে পারে। জুরিসপ্রুডেন্স ফিরে লেখা দরকার। আইনের দর্শনের মূল ধরে উপড়ে ফেলা দরকার। পৃথিবীতে এত কাজ একদম শুরু থেকে আবার শুরু করা দরকার। এসব তার মত লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্যে চাই গণ-আন্দোলন। সার্বিক দার্শনিক বিশ্বাস। এত বড় কাজ—হয়তো গান্ধীজী পারতেন। প্রপার্টি, ওম্যান, রিলেসন, রাইট।

শরদিন্দু এখন কারও সঙ্গে তেমন কোন সম্পর্ক খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এই দীর্ঘ জীবনের অনেকটা তিনি না জেনে কাটিয়ে এসেছেন। এখনো অনেকটা কাটাতে হবে তাঁকে। এবার কিন্তু তিনি জানেন। বিশেষ করে জানেন—এতকাল যা জেনে এসেছি—তা ঠিক নয়। এখন যতদিন যাবে—ততই আমি একা। খুব একা। আকাশের নিচে—বানানো ঘরবাড়ির ভেতর—তার চেয়েও বানানো আদালত, বিচারপতি, সাজা ইত্যাদি দিয়ে সাজানো একটা ধোঁকা। নয়তো রানীকে জড়িয়ে ধরলাম—আবার বলেও দিলাম—আবার আমি তোমার দাদাবাবু হয়ে গেলাম রানী!

এ তো সেই ক্যানিউটের দশা। রাজা ক্যানিউট ঢেউগুলোকে বলেছিলেন, তীরে এগিয়ে এসো না। পিছিয়ে যাও বলছি—

জীবনের ঢেউগুলো ও ভাবে ফেরানো যায় না। কোন ঢেউ আইনের উপধারার অধীন নয়। বিচারপতির শাস্তির করায়ত্ত নয়।

নয়তো সেদিন নীপার জেরার মুখে আমি রানীর চোখে চোখ রেখে তাকাতে পারিনি কেন? আমার কিছু ছিল নিশ্চয়। রানীর কিছু ছিল না। তাই সে সহজেই তাকাতে পারছিল। আমিও তো বলতে পারিনি—ছাখো নীপা—এমনি বিচারে তোমার পাশে ওই ঘেমো তের নম্বরের মেয়েটা আসলে আস্ত একটা পেত্নী। কিন্তু তবু সেই মুহূর্তে আমার ওরকম ইচ্ছে হয়েছিল। দিক ঘোলানো কোন ঝড়কে দিক হারানোর জন্যে কৈফিয়ত করতে হয় না। মানবজীবন কী কঠিন হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। ভাববার কথা।

ইওর লর্ডশিপ বলে আসামী পক্ষের উকিল কী শুরু করতে যাচ্ছিলেন। কোর্ট ক্লার্ক আগে ঠিক করে রাখা নিয়মমাফিক এজলাশকে জানালেন, কোর্ট মুলতুবি হয়ে গেল। ১১ জুলাই কোর্ট বসলে আবার কেস উঠবে।

ঠিক এই সময় তের নম্বরে বর্ষা এসে কলতলায় খানিকক্ষণের জন্যে ঢেউ তুলে দিলো। পোড়ো সাহেববাগানের যেখানে যত পোকা ছিল সব ফরফর করে উড়ে এসে ঘরগুলোর ভেতর ঢুকতে গেল। লোড-শেডিং। জ্বালাতনের একশেষ। বৃষ্টি পড়ে গরম বরং বেড়ে গেল।

বর্ষার বিকেলের অন্ধকারের সঙ্গে তের নম্বরের কয়েকটা তোলা উনুন যত পারে ধোঁয়া মিশিয়ে দিয়েছে।

রানী তার কোল থেকে ছোটো খোকাকে নামতে দিল না। জগাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললো, ও মিস্ত্রী। তুমি বরং একজন অ্যালোপ্যাথিক ধরে আনো।

আর ক'টা দিন কবিরাজের মালিশটা চলুক না।

না। শেষে না ছেলে জন্মের মত খোঁড়া হয়ে যায়। তুমি একজন

অ্যালোপ্যাথি ধরে আনো বরং। যা আছে তাই বেচে না হয় চিকিৎসা করাবো। হাঁটতে পারছে না ছোটো খোকা।

এই ভরসন্ধেবেলা লোডশেডিংয়ের ভেতর কোন অ্যালোপ্যাথ তের নম্বরে আসতে চাইবে না রানী।

ছেলেটা খোঁড়া হয়ে যাবে তাই বলে?

তাই বলেছি? কাল সকালে দিনে দিনে ঠিক ডাক্তার ধরে আনবো। রাতটা কাটিয়ে দে। জ্বর তো কবিরাজ মশাই কমিয়ে দিলো। এখন আর নেই।

ও জ্বর অমনি নেমে যেতো মিস্ত্রী। কবিরাজ না ছাই। টিপে টিপে পয়সা আদায়ের ফিকির শুধু।

সে কোন্ ডাক্তার নয় রানী। বে হয়ে এসে তুই তো তের নম্বরেই বড় হোলি। তুই বল?

তাই বলে অমন হাতুড়ের বড়ি এই রুগী খোকাকে আমি হাতে ধরে দিতে পারবো না আর। বুকে হাত দিয়ে বলো তো মিস্ত্রী—কবিরাজ হয়ে সহদেব কেন অত গাছগাছড়া নিয়ে জেল গেটে বসে থাকে। সব শুনিছি আমি। খালাস পাওয়ায় আসামী তো আর ওদিকে যায় না। একবারের মত তাকে ছুয়ে নিয়ে ছিবড়ে করে ছেড়ে দেয়। কোন কবিরাজকে তুমি আলিপুরে জেল গেটে বসতে শুনেছো কোন দিন?

আচ্ছা থাক না রানী। আমাদের তের নম্বরের বাসিন্দা তো লোকটা।

বড়খুকী সত্যি ন'বছরেই বুড়ির ধরনধারণ পেয়েছে। ছোট দু'ভাইকে মুড়ি দিয়ে বাপকে বললো, চা খাবে তো বল। তাহলে বানাই।

যদিও সে নিজে ওই বয়সে চার বছরের পুরনো বউ—তবু দিন কাল বদলে গিয়ে এই আবহাওয়ায় নিজের মেয়েকে অমন দেখতে চায় না রানী।

বৃষ্টি থেমে নেই। বাবুদের পাড়ার রাস্তাগুলো এখান থেকে উঁচু। তাই ঢালের জল সব এদিকে চলে আসছিল। কাছাকাছি কোন বড় নালা আছে। তাতে গিয়ে সব জল পড়ছে। তার একটানা কলকল, ছড়ছড়।

বললেই তো হুট করে ডাক্তার আনা যায় না রানী। বড় ডাক্তার আনলেই হবে না। ওষুধ চাই—পথ্যি চাই। এসব না হলে ডাক্তারের বিধান খাটবে কেন? হাত তো ফর্সা। বর্ষা এলে কাজ কমে যায়।

চার দিন যে পর পর কাজ করলে বৌদিদিমণির ঘরে। সে পয়সা কি হোল? দিন গেলে বিশ টাকা?

বৌদিদিমণির ঘর কথাটা শুনেই জগাই মিস্ত্রীর গায়ে ঠাণ্ডা ছ্যাঁকা লাগলো। মুখে কোন উনিশ বিশ না করে বললো, পুরুষমানুষ পয়সা কামাই। বে করে এনে যাকে বড়টি করলাম—চার ছ্যানার মা-টি বানালাম—তাকে হিসেব দিতে হবে?

সে কথা বলিনি মিস্ত্রী।

তার চেয়ে বলতো—তোকে যা বলেছিলাম—করেছিস?

তুমি তো আমায় জানো। ও কাজ আমায় দিয়ে হবে না মিস্ত্রী।

খুব হবে। তোর মত মেয়েমানুষরাই পারে ভালো।

উহু। একটা লোককে চাপ দিয়ে টাকা আদায় করে—বদনামীর ভয় দেখিয়ে মাসকাবারী পয়সা নেওয়া?—উহু। সে শিক্ষা তুমি আমায় দাওনি মিস্ত্রী। ওসব করি আর ছোটো খোকা আমার সেই পাপে খোঁড়া হয়ে থাকুক সারা জন্ম।

তা হবে কেন? তোকে তো জড়িয়ে ধরেছিল। নিজের বউটা ছাড়া রেখে—

দাদাবাবু বৌদিমণি কেউ লোক খারাপ নয়।

খারাপ বলেছি! তুই এবারে বাবুকে একলা পেলেই বলবি—সব বলে দেব। সবাইকে বলে দেব। ভাল চান তো নগদা খসান।

বলার আছেটা কি মিস্ত্রী? ঘটলোই বা কি এমন—যা কিনা ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে সবাইকে বলা যায়।

ওই হোল। ওইটুকুতেই অনেকখানি। মেয়েমানুষ নিজ মুখে তার ওপর জুলুম, জবরদস্তির কথা বলছে—সবাই বিশ্বাস করে। ওতেই তো ভয় পাবে জজবাবু! ধর ছোটো খোকার অসুখটা ভাঁরিতে গিয়ে দাঁড়ালো। পয়সার তো দরকার হবে। খোকার মুখ চেয়ে এটা কর। সবার ভালো হবে বলছি রানী। এতে আমাদের সবার ভালো।

বৃষ্টিতে রানীর কানে আর কোন কথা যাচ্ছিল না। গাছপালার আড়াল দিয়ে বৌদিদমণির বাড়ি এখান থেকে চোখে পড়ে না। হাসপাতালে দেখালে হয় না খোকাকে—

বর্ষায় টেনিস বন্ধ। বন্ধ দৌড়ঝাঁপ। তাই হাঁটা ধরেছেন শরদিন্দু।

এক একদিন এক একদিকে হাঁটেন। হাঁটতে গিয়ে বোঝেন—আইন আছে শুধু আদালতে। বাকি দুনিয়া চলে নিজের পছন্দ মত। আমরা আইন কলেজে যে আইন পড়েছি—সে আইন ছিল ৪০ কোটি মানুষের ইণ্ডিয়ার জন্যে। এখন এই ৭০ কোটির ইণ্ডিয়ায় ও-আইন অচল। কে মানবে! বাবা তার জায়গা হারিয়ে বসে আছে। মা তার মায়ের জায়গায় নেই। ছেলে আরেক রকম হয়ে গেছে। সমাজ জিনিস। কোটি কোটি অতিরিক্ত মানুষের চাপে দুমড়ে মুচড়ে থেঁতলে গেছে আমের ঝুড়ির মত। এদিক সেদিক দাগী পচা গলা জিনিস বেরিয়ে পড়েছে।

আজ হাঁটতে হাঁটতে তিনি আদিগঙ্গার সিমেন্ট পুলের কাছে চলে এসেছেন। এখানটায় একটা ছবিঘর আছে—যেখানে জোয়ারে গঙ্গার জল সিনেমা হলে ঢুকে পড়তো। স্লাইড দিতো পর্দায়—জল উঠিয়াছে। পা তুলিয়া বসুন। তখন হয়তো পর্দায় কোন খটখটে শুকনো দিন দেখানো হচ্ছিল। স্টুডেন্ট লাইফে কলকাতায় খুব ঘুরতেন শরদিন্দু।

সিমেন্ট পুল থেকে কয়েক সিঁড়ি নেমে সেই ছবিঘর। তার পাশেই পাঁঠা ঝোলানো মাংসের দোকান। আগের মতই সন্ধের ঢিমে আলোয় গলির মুখে মেয়েরা দাঁড়িয়ে।

কী খেয়াল হোল শরদিন্দুর। ঢুকে পড়লেন গলিতে। স্টুডেন্ট লাইফে হয়তো ইচ্ছে ছিল। হিংয়ের গন্ধ গলির ভেতর আরেকখানা পৃথিবী শুরু হয়ে গেল। চায়ের দোকানে খুব করে চামচা ঘুরিয়ে চিনি মেশাচ্ছে একজন। উল্টোদিকের দরজায় আবছা অন্ধকারে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। বয়স তিরিশের দিকে নিশ্চয়। লতাপাতা আঁকা কালো শাড়ি। শরদিন্দু সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

মেয়েটি পরিষ্কার বললো. শরীর ভালো নেই। অন্য ঘর তো আছে। আ হা—আমায় না হলে হচ্ছে না— ?

শরদিন্দু পিছলে আর এক দরজার সামনে দাঁড়ালেন। গলির ভেতর গাছপালা সমেত কোঠাবাড়ি। প্লাইউডের দরজা। পেয়ারা গাছ, কুয়ো, বারান্দায় মাটির দেওয়ালে কাঁচ বাঁধানো সাধের আসন। একটা ছাড়া টিয়া অন্ধকারে বিস্কুট ঠুকরে খাচ্ছিল। শরদিন্দুকে দেখে আলোয় বেরিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনজন মেয়েমানুষের হাসির কোরাস। জাসটিস শরদিন্দু ঘোষাল ভড়কে গিয়ে আগের দরজায় ফিরে এলেন।

বলছি শরীর খারাপ।

মুখ দেখতে পেলেন না শরদিন্দু। তবে দাঁড়িয়ে আছো ?

এত পছন্দ! তাহলে চলো। আমায় কিন্তু একটা বিয়ার খাওয়াবে—

যা ইচ্ছে খেও। আমি বাইরে দাঁড়াতে পারছিনে আর। চলো।

এত বেগ নিয়ে আসো কেন ?

বাজে কথা বোলো না।

কেউ দেখে ফেলবে ?...মান যাবে! চলো। তুমি কিন্তু কিছু মোটা আছো মাইরি। ঘরে যেতে যেতে মেয়েটি বললো। আমার নাম প্রতিমা।

নাম দিয়ে কি করবো ? আমায় মোটা বলছো ! কোথায় মোটা দেখলে ?

দরজা আটকাতে আটকাতে প্রতিমা বললো, আহা ! খুব লেগেছে মনে। আর কক্ষনো বলবো না। দাও টাকা দাও। বিয়ার আনাই। তুমি খাবে ?

না।

তাহলে চুমুও খাচ্ছো না। আমাদের কেউ চুমু খায়না মাইরি।

কেউ না ?

মেয়েমানুষ ভালো করে দেখেনি—এই যেমন কলেজের ছাত্তর—খানিকক্ষণ আগে এয়েচিল একজনা—খুব করে চুমু খেলো আমায়। শেষ হয় না। ছাড়াতে পারিনে। খালি ভালবাসতে চায়। বলোতো ল্যাঠা ! এখেনে ভালোবাসা নিয়ে বসে আছি যেন আমি। আমায় কিন্তু পঁচিশ টাকা দেবে।

সারা রাত যদি থাকি ?

আগে বোলো। ক'খানা রুটি হাতে গড়ে নেব। আর খানিকটা তরকারি। আচার খাও তো ?

মাঝে মাঝে খাই।

কনসেসন করে দিচ্ছি। ষাটটা টাকা দিও ভোরবেলা।

শরদিন্দু ঘোষাল মনে মনে বললেন, সারারাত—অথচ মোটে ষাট ? মানুষ কি সস্তা। কিন্তু মুখে বললো, ওরে বাবা। ষাট টাকা।

কেন ? বেশি হয়ে গেল খুব ?—তারপর কি ভেবে প্রতিমা বললো, দুপুরে এসো না হয় একদিন। খুব কমে করে দেব ! এসে দেখো।

মাটির দেওয়ালে একটি বালবের আলো খানিকক্ষণের জন্যে দিব্যি ঘরোয়া করে দিল দু'জনকে। সময়মত প্রতিমা বললো, একদম ওপরে উঠো না মাইরি। সবটা পারবো না।

এই সময়ে ঐসব কথা কার ভাল লাগে। শরদিন্দু চমকে উঠলেন। তাহলে ?

আমার প্রেসার আছে যে—।

নেমে গিয়ে পাজামা, পাঞ্জাবি পরে জুতোয় পা গলাতে গলাতে শরদিন্দুর প্রথমেই মনে হোল, এ মৌচাক থেকে বেরোবার পথ কোনটা ?

একটা কথা আছে দাদাবাবু।

লোডশেডিং। গ্রাউণ্ড ফ্লোরের গ্যারেজে একটাও গাড়ি নেই। লিফট বন্ধ। গরমে সবাই এদিক ওদিক ছটকে গেছে। প্রথমবার শরদিন্দু বুঝতেই পারেননি। তাকে আবার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে কে ডাকবে।

দাদাবাবু—

কে ? কে তুমি ?

আমি রানী।

চমকে উঠলেন শরদিন্দু। এখানে কি করছো ?

আমার একটা কথা আছে দাদাবাবু—

দপ করে আলো জ্বলে উঠলো। কি কথা ? বলো—। বলেও সরাসরি তাকাননি শরদিন্দু। বাড়িতেও তো বলতে পারতে। এখানেই না বললে নয় ?

কারও জবাব না পেয়ে শরদিন্দু তাকালেন। লিফ্‌ট-এর জন্যে দু'দিকে দুটো খাঁচা। অনেকটা নিয়ে গ্রাউণ্ড ফ্লোর। খানিক দূরে গিয়ে চোখ ফিরে আসে। কিন্তু দেখা যায় না। অন্ধকার মত—একটা বাগান আছে। সেখানেও নাকি হাই-রাইজ বাড়ি উঠবে।

কোথায় গেল রানী ? কোথায় যেতে পারে ? দারোয়ান, ফ্ল্যাট বাড়ির ইস্ত্রিওয়ালা—সব ফিরে আসছিল একে একে। যে লোক ফাঁসি দিতে পারে—জেল দিতে পারে—তার এভাবে বিনা কাজে ওদের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। নানা রকম জানার ইচ্ছে বেড়ে যাবে ওদের।

॥ ৫ ॥

একটা কাক মরলে সারা পাড়ায় ইলেকট্রিক তার, কার্নিস, মেজানিন ফ্লোরের ঝুল বারান্দায় রাজ্যের কাক বসে মিটিং করে। তখন নিচে পড়ে থাকে মরা কাকের ডেড্‌বডি।

এখন অবিশ্যি গুরুসদয় দত্ত রোডে কোন মরা কাকের ডেড্‌বডি নেই। শরদিন্দুর বরং নিজেকেই মরা কাক মনে হোল। বেলা তিনটে। ফ্ল্যাটবাড়িগুলোর পুরুষরা যে যার কাজে বেরিয়েছে। মহিলারা যে যার দিবানিদ্রায়। এসব ফ্ল্যাটবাড়িতে তাদের সুন্দরী থাকতে হয়। থাকার চেষ্টা তো থাকেই। তাই বাড়ির পর বাড়ি নিঃঝুম। শরীরটা ভাল যাচ্ছে না বলে বেরোননি শরদিন্দু। আসলে ক'দিন ধরে তিনি একটা সংশয়ে ভুগছেন।

দস্তিদার-সরদার-শিকদার মামলায় বিচারক কোন্ পথ নেবে? বলাৎকার, প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করতে খুন এবং তারপর খুনের প্রমাণ মুছে ফেলতে লাশ গুম অপ্রমাণিত একটি প্রশ্রয়ের হাসি--কোনো এক হরতালের সকালে। যে সকাল সময়ের ইতিহাসে অলরেডি খরচা হয়ে গেছে। আর ফিরে আসবে না। যাদের জন্য একজন অপরিচিত লোক মর্নিংওয়াকের সময় তাঁকে রিকোয়েস্ট করতে এসেছিল। অন্যায় অনুরোধ।

শরদিন্দু ঘোষাল দস্তিদার-সরদার শিকদার মামলার রায়ের একটা খসড়া খাড়া করবেন বলে বাড়ি আছেন। ক'দিন ধরেই ভেবে চলেছেন। রক্তের ভেতর একটি মুহূর্তের ঝটকা। যাকে বলা যায় ইমপালস। তার পরিণাম এতখানি! স্বাভাবিক অস্বাভাবিকের সমাচ্ছন্ন সীমানা। এর মাঝখানেই মানুষের বিকাশ, সভ্যতা, ইতিহাস শিকড় নামিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

একঘেয়ে লাগছিল বলে ভেবেছিলেন--ঘুরে আসি গুরুসদয়

রোডের বুড়ো গাছগুলোর ছায়ার ভেতর দিয়ে। বিকেলের বাতাস গাছের ভেতর দিয়ে তার কানের জায়গাটা ছুঁয়ে গেলে মাথাটা সাফ লাগে।

কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে একি কাকের জটলা! আমি কি মরা কাক?

দৃশ্যটা দেখে শরদিন্দুর বুকের রক্ত এই চড়া রোদেও হিম হয়ে গেল। ফাঁকা গ্রাউণ্ড ফ্লোরের অনেকটা জুড়ে বাড়ির কাজের মেয়েরা ঘিরে বসে আছে। এরা এ-বাড়িরই ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে কাজ করে। অনেককে তিনি লিফ্‌টে ওঠানামা করতে দেখেছেন।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আর এগোনো হোল না শরদিন্দুর। ঠিকে-ঝিরা তারই দিকে তাকিয়ে গোল হয়ে বসে হাসছে।

এ কি তাহলে ঘেরাও? যে ঘেরাওয়ের বিরুদ্ধে তিনি একটা রায় দিয়েছিলেন। ঘোষাল রুলিং নাম দিয়ে যা-কিনা ল' জারনালে বড় করে ছাপা হয়েছিল। বিধানসভায় এ নিয়ে সে কি হৈচৈ। সেই ঘেরাও? ওদের জটলা ফুঁড়ে জাসটিস ঘোষাল বেরোবার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। বিশ বাইশজন ঠিকে ঝি রাস্তাটা আটকে বসে। তারা হোহো করে হেসে উঠলো একসঙ্গে। কোনদিকে যাবেন দাদাবাবু?

হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন শরদিন্দু। এ কি? পথ আটকে আছো কেন তোমরা? পথ দাও।

তাতো দেবোই! পথ না দিয়ে পারি আমরা বাবু? তুমি তের নম্বরে যাবে না!

মানে?

সঙ্গে সঙ্গে অল্পবয়সী, মাঝবয়সী কাজের মেয়েরা হেসে উঠলো। ওরই ভেতর একজন বললো, পথ ছেড়ে দেরে পথ ছেড়ে দে—রানী হয়তো এখন ঘুমুচ্ছে।

আর একজন বললো, বাবু গেলে তবে চায়ের জল চাপাবে।

কি বাজে বকছো তোমরা। পথ ছাড়ো বলছি।

পথ তো কেউ ছাড়লোই না—উপরন্তু হাসির গররায় ফাঁকা গ্রাউণ্ড ফ্লোরটা ভরে গেল। ভাগ্যিস দারোয়ান বা ইস্ত্রি করার লোক দু'জন নেই। দুই লিফ্‌টের লিফ্‌টম্যান দু'জন দুপুরে কোথায় কাজ করে। ড্রাইভাররা সাহেবদের নিয়ে এখন ডালহৌসির অফিস পাড়ায়। নয়তো শরদিন্দু ওদের সামনে জানাজানির ভয়ে সিঁটিয়ে যেতেন একদম। তার চেয়ে দুঃখের—তার চেয়ে অপমানের আর কি হতে পারতো।

চারদিক শুধু কংক্রিট। তার ভেতর ঠিকে ঝিদের গোল হয়ে বসে এই ঘেরাও শরদিন্দুর মাথার ভেতর চলন্ত করাত হয়ে বসে যাচ্ছিল। গ্রাউণ্ড ফ্লোরের বাইরেই সাজানো গোছানো নির্জন রাস্তা। একটা দু'টো গাড়ি স্পিডে বাঁক নিচ্ছে। খানিক বাদে অফিস-ফিরতি গাড়ির দল ঝাঁকে ঝাঁকে এ-পথ দিয়ে বাড়ি ফিরবে।

আরেকবার এগোতে গিয়ে অল্পবয়সী একটি মেয়ের দিক থেকে বাধা পেলেন শরদিন্দু। অথচ হটে গিয়ে যে পিছোবেন—তাও পারছিলেন না তিনি। তাতে যে আরও অপমান।

মেয়েটি রানীর চেয়ে ছোটোই হবে। এগিয়ে এসে বললো, রানীদিকে মনে ধরেছে বুঝি।

তার হাতখানা এক ঝটকায় নিজের মুখের কাছ থেকে সরিয়ে দিলেন শরদিন্দু! কি অসভ্যতা হচ্ছে? অ্যাঁ?

তা তো বলবেন বাবু। আপনিই তো বলবেন। কথা শেষ হোল না মেয়েটির। অন্য মেয়েদের হাসি আর চুটকিতে তার গলার আওয়াজ ডুবে গেল

এর ভেতর একজন বলে উঠলো, ওরে বেশি কাছে যাসনি। জজ হয়! শেষে ফাঁসি দিয়ে দেবে—

আরেকজনের ফোড়ন, সাজা না দিয়ে জড়িয়েও ধরে।

উঃ! অত সোজা নয়। বৌদিমণি আছেন না—

আবার সেই হাসির ফররা। শরদিন্দু ঘোষাল এক রকম দৌড়েই দু'নম্বর লিফ্‌টে ঢুকে পড়লেন। গেট টেনে বন্ধ করলেন। তারপর টেন লেখা বোতাম টিপে ধরলেন।

লিফ্‌ট ওপরে উঠছিল—আর জাসটিস ঘোষাল বুঝতে পারছিলেন—তিনি এক অনন্ত কুয়োর ভেতর থেকে ওপরে উঠছেন—উঠছেনই—কুয়োটা শেষ হবার নয়—এত গভীর—একদম পাতালের শাঁস বা বীজ থেকে যেন এ-কুয়োর শুরু।

অনেকদিন আগে রাস্তায় এক ট্যাকসি ড্রাইভার তাঁকে নিতে অরাজি হওয়ায় শরদিন্দু আদালতে বসে সমন জারি করেছিলেন। তার আদেশে ট্যাকসিওয়ালাকে ধরে আনা হয়েছিল। তাছাড়া আদালত অবমাননা বলে একটা কথা তো আছে। যার আসল মানে বোধ হয়—বিচার ব্যবস্থাকে অবহেলা করা। কিংবা আরেকভাবে দেখলে—মহামহিম বিচারপতিকে কলা দেখানো। খবরের কাগজ, রাজনৈতিক নেতা, আইনসভা—কে নয় আদালতকে ওরফে বিচারপতিকে সমঝে চলে? এক একদিন বিকেলে হাইকোর্টের করিডর দিয়ে হেঁটে নিচে নামবার সময় মনে হয়—আইন, বিচার, সাজা, পুরস্কারের মত ভারি ও মহৎ ব্যাপারগুলোর কথা মনে রেখেই এই বিচার বাড়ির বারান্দা বানানো হয়েছিল। কী উদার। কী গম্ভীর। কতটা টানা আর লম্বা। খয়েরি রংয়ের খিলান। নিরাভরণ অথচ সুচারু।

প্রায় দৌড়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা আটকে দিলেন শরদিন্দু। ক্যালেণ্ডারের তারিখ তিনি দেখতে পাচ্ছেন—কিন্তু কোন্ মাস? কিংবা, কি বার? তা তিনি বুঝতে পারলেন না। বিচার বিভাগের শক্তিতে তাঁর এতকালের বিশ্বাস—এতদিনের সম্পর্ক খানিকক্ষণ আগে চুরমার হয়ে গেছে গ্রাউণ্ডফ্লোরে—ঠিকে ঝিদের জটলা বা ঘেরাওয়ের মুখে পড়ে।

ওদের বিরুদ্ধে জাসটিস ঘোষালের কোন অ্যাকশন নেবার উপায়

নেই। মানহানি? পথ অবরোধ? ইলিগাল ট্রেসপাসার? কোন মামলাই দাঁড় করাবার উপায় নেই। কারণ, ওরাই তো একটু আগে তাকে নিজেদের কাঠগড়ায় জোর করে তুলে দিয়েছিল। তাই তো মনে হচ্ছে শরদিন্দুর। খানিক আগে আমি ওদের আদালতে আসামী হয়ে গিয়েছিলাম—খানিকক্ষণের জন্যে।

কিছু করার নেই আমার। কিছু না। এ মামলা কোর্টে তোলা মানেই তো—একজন বিচারপতি ও কাজের মেয়ের কাহিনী হয়ে যাবে কাগজে কাগজে। পাঁচ কান হয়ে ব্যাপারটা অন্য চেহারা পেয়ে যাবে। কেউ বুঝবে না—বুকের ভেতরে মুহূর্তের ভূমিকম্প বাইরের সামাজিক মেলবন্ধনগুলো কিভাবে তছনছ করে দেয়। অথচ ভূমিকম্পটা খুবই ছোট আর সাময়িক।

বাইরে খটখটে আলো। দরজা জানালা আটকে শরদিন্দু টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে দিলেন। ছোট সেক্রেটারিয়েট টেবিলে নথির পর নথি সাজানো। খোলা কলম। সাদা কাগজ থেকে দফিদার-সর্দার-শিকদার মামলার রায়ের খসড়া লাইনগুলো জ্যান্ত কথার মত ফুটে উঠছিল।

সেদিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন জাসটিস ঘোষাল। ঠিকে ঝিদের নাম জানি না। সম্ভবত সবাই তের নম্বরের বাসিন্দা। ওদের বাপ, ভাই, স্বামী, ছেলের নামও জানি না যে সুবিধামত নোটিশ পাঠাতে পারি।

পেনাল কোডের ৩০৩ ধারার সঙ্গে এভিডেন্স অ্যাক্টের কোন্ কোন্ উপধারা একসঙ্গে করে বিবেচনা করতে হবে—তাই লিখতে গিয়ে খচ করে শরদিন্দুর মনে হোল—একটু আগের ঘেরাওয়ে আমার জন্যে ওদের যেসব ধারা ছিল—তার মোদ্দা কথাটা—লোকলজ্জা, কেলেঙ্কারি, সুনামে ক্ষয়, সমাজের ব্যবস্থাগুলো একটু নেড়েচেড়ে দেওয়া।

কিন্তু আমার কথার পরেও রানী সবকথা পাঁচ কান করে

বেড়ালো ? ওর কি লোকলজ্জা নেই ? ওর স্বামী তো নীপার কাছে ফুরোনে কাঠের কাজ করে যাচ্ছে ক'দিন ধরে। জগাই মিস্ত্রী শুনলে কি বলবে ?

হাসপাতাল বললো, অপারেশন করতে হবে।

ভিড়ে ভিড়াক্কার। তার ভেতর রানীর কোলে তার ছোটো খোকা। পাশে জগাই মিস্ত্রী। হাতে এক টুকরো কাগজ। সে অনেক সাহস জড়ো করে বললো, ব্যাপারটা যদি বুঝায়ে বলেন ডাক্তারবাবু।

ছোকরা ডাক্তার একটু চটে গেলেও ওদের দেখে নরম হলেন। পাছার হাড়ের ভেতর খারাপ রক্ত জমে গিয়ে—

রানী কেঁদে ফেললো। ওমা। কী হবে ডাক্তারবাবু !

ভয়ের কিছু নেই। ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি। কাগজে লিখে দিয়েছি। আট নম্বর ঘরে গিয়ে বুধবার দু'খানা ছাব তোলাবে।

তারপর কি হবে ?

কাঁদছো কেন ? একটখানি কেটে দিলে খারাপ পুঁজরক্ত বেরিয়ে যাবে।

কাটবেন ?

জগাই মিস্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ডাক্তার বললেন, তোমার বউ ?

হ্যাঁ ডাক্তারবাবু। খোকার মা।

এমন লোককে হাসপাতালে থাকবে না। কাঁদাকাটির কিছু হয়নি। ছেলে সেরে যাবে। নেক্সট—

ছোটোছেলে কোলে রানীকে সরিয়ে লাইন ডাক্তারের দিকে আরেকটু এগিয়ে এলো।

রাস্তায় বেরিয়ে রানী বললো, আমার ছেলে আমি কাটতে দেব না মিস্ত্রী।

এখুনি খুঁড়িয়ে হাটে। এরপর তো খুঁতো হয়ে থাকবে। বয়স-কালে তোকেই দুষবে রানী।

তা হুষুক। তুমি অন্য ডাক্তার দ্যাখো মিস্ত্রী।

রাস্তা পুড়ে যাচ্ছিল রোদে। কোথাও ছায়া নেই। বাসট্রামে মানুষ কুমড়ো করে গাদানো। এর ভেতরেই জগাই মিস্ত্রী ঠোঁট বাঁকা করে হাসলো। সে পথ তোর হাতে রানী। কিন্তু তুই নিজেই যদি আলিস্যি করিস—গরম থাকতে থাকতে নিম পাতার রস দিতি হয় ঘায়ের মুখি।

কিরকম? বলে মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়লো রানী। বাস যাচ্ছিল। হাত টেনে ধরলো জগাই মিস্ত্রী। সরে আয়। সরে আয় আগে—

কি বলবার বলো মিস্ত্রী।

সে চোখে তাকিয়ে জগাই খুব আস্তে বললো, ডাক্তার দেখতে টাকা লাগে। বড়ির দাম লাগে। পথ্যির পয়সা লাগে তা তুই তো জজসাহেবরে বলবার পারিসনে।

এবার আমি বলবো।

বলা তো উচিত তোর। একটু চাপ দিলি গলগল করে পয়সা বেরোবে। ভদ্দর লোকদের খুব লাজলজ্জার ভয়—একথা জানিসনে রানী। এত বাড়ি কাজ করলি তোর জীবনে।

রানী খুব আস্তেই বললো, জানি।

॥ ৬ ॥

১৬ জুলাই। বুধবার। আজ কলকাতায় খুব বৃষ্টি।

সন্ধ্যার মেঘ ডুবন্ত সূর্যের আলো যেখানেই পাচ্ছিল—সেখানেই লালচে হয়ে উঠছিল। রানীর চোখের সামনে তার মিস্ত্রীমশাইকে সঙ্গে করে বৌদিমণি একটু আগে বাজারে গেছে। ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে কোন্ রঙের কাঠ দিতে হবে—তাই বেছে দিতে তার

স্বামীকে সঙ্গে নেওয়া। একটু আগে ওরা চলে যেতে সামনে দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসেছে রানী। দাদাবাবু আদালত থেকে ফিরলে চা করে দিয়ে তবে রানীর ছুটি। তখন মিস্ত্রীর সঙ্গে বাড়ি ফিরবে সে।

এখন বন্ধ বাড়িতে সে একা। দাদাবাবুর ঘর পরিষ্কার গোছানো। লেখার টেবিল। কাগজ কাটার ছুরি। কলম একটার পর একটা টেবিলে দাঁড় করানো। কালির শিশি। নিজের ছবি দাদাবাবুর। বৌদিমণি আর ছেলের সঙ্গে ছবি। তার পাশেই সেই দেখা-দেখির যন্তরটা। কালো দু'টো নল। তার শেষে পরিষ্কার কাচ।

রানী তুলে নিয়ে চোখে লাগালো। আশ্চর্য। ছবির দাদাবাবু কত বড় হয়ে একদম কাছাকাছি তার দিকে তাকিয়ে হাসছেন। এটা দূরবীন। তাইতো বলেছিল বৌদিমণি। ওমা। বৌদিও তো হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে। কী সুন্দর যন্তর। ছোট হাসি বড় করে দেয়।

দরজার বেল বেজে উঠতেই রানী জায়গার জিনিস সাবধানে জায়গায় রেখে দিল। দাদাবাবু ফিরলো।

একটু পরে শরদিন্দু কলঘর থেকে ফিরে জানতে চাইলো, নীপা কোথায়?

বাজারে গেছেন।

মিস্ত্রী?

ওকে সঙ্গে নিয়ে গেছেন—কাঠ বাছাই করতে। চা করে আনবো?

রানী চলে যাচ্ছিল। শরদিন্দু ডাকলেন, শোনো।

রানী দরজায় দাঁড়িয়ে গেল।

সেদিন কী কথা বলতে আমায় দাঁড় করালে রানী? আলো জ্বলে উঠতেই আর দেখতে পেলাম না—কি কথা বলবে? বলো। এখন তো বলতে পারো।

রানী টের পেল—সে থরথর করে কাঁপছে।

ভয় নেই রানী। তোমাকে আর জড়িয়ে ধরছি না। সামনা-সামনি বলো। আমার ঢের শিক্ষা হয়েছে।

তবুও রানী কোন কথা বললো না। প্রায় মিনিটখানেক চুপচাপ চলে যেতে দিয়ে শরদিন্দু বললেন, তোমার কাছে তো ঘাট মেনেছিলাম। তবু তুমি কথাটা পাঁচ কান করলে?

গলায় যে কেন কান্না আসছে তা জানে না রানী। দাঁতে আঁচল কামড়ে ঘুরে তাকালো, আমি তো পাঁচ কান করিনি দাদাবাবু। শুধু —থেমে গেল রানী।

শুধু? শুধু কাকে বলেছো?

আপনাদের মিস্ত্রীমশাইকে—

তোমার স্বামীকে বলেছো? জগাই মিস্ত্রীকে? সে সব জানে?

সব। আমার স্বামী হয়তো! পাঁচ বছর বয়সে আমায় বে করে এনেছিল মিস্ত্রী। ওরে আমি কিছু লুকোতে পারিনে দাদাবাবু।

সব বলেছো? আমার ঘাট মানা?

সব। ছোটবেলায় আমার কাঁথা পালটে দিতো মিস্ত্রী। তাকে না বলে পারিনি।

ও। বলে চুপ করে গেলেন শরদিন্দু। সত্যিই তো পাঁচ বছর বয়স থেকে যে-লোকটার বউ তাকে না বলে পারে কেউ! তাহলে পুরো ব্যাপারটা জগাই মিস্ত্রীই ছড়িয়েছে। ভালো। যেমন র‍্যাঁদা চালানো গাট্টাগোট্টা হাত, শরীর—এ লোককে ধমকে ধামকে বোবা রাখা যাবে না। কিন্তু পাঁচ কান করে ওরই বা কি লাভ হচ্ছে। নিজের পরিবার নিয়েও তো ঢি ঢি পড়ে যাচ্ছে। না তের নম্বরে ওসব নিয়ে ঢি ঢি পড়ে না। এই যে সেদিন তাকে মরা কাকের ডেড্‌বডি জ্ঞানে আশেপাশের ফ্ল্যাটের ঠিকে ঝিরা ঘিরে ধরেছিল—তাদেরও খবরের সোর্স তাহলে জগাই মিস্ত্রী? আর তাকে নিয়েই নীপার যত কাঠের কাজ?

ঘুরে তাকিয়ে সরে যেতে পারেনি রানী। তার দিকে তাকিয়ে

উনচল্লিশ চল্লিশ বছরের ছিমছাম জাসটিস ঘোষাল বলে বসলেন, আমার অপরাধ রানী—তোমায় দেখে ভালো লেগেছিল আমার—

ও কথা বলতে নেই দাদাবাবু। আর বলবেন না।

তুমি খামোকা তোমার বৌদিমণিকে সব বলতে গেলে কেন? না বললেই পারতে—

ও কথা যাক দাদাবাবু।

শরদিন্দু বললেন, আমার এখনো তোমায় দেখতে ভালো লাগে রানী। খামোকা মিস্ত্রীকেও বলে বসলে।

ছি ছি দাদাবাবু। ও সব বলবেন না। আপনি একটা কেউকেটা লোক। আমরা থাকি তের নম্বরে। বাড়ি বাড়ি কাজ করি।

তোমাদের উঠোনে একটা গাছ আছে।

পেয়ারা। আপনি জানলেন কি করে? গেসলেন?

যাবো কেন। ওই তো দূরবীন রয়েছে। কলতলা না কুয়োতলা বুঝলাম না। পাশেই পেয়ারা গাছটা।

আমাদের দেখা যায়? বলতে গিয়ে হেসে ফেললো রানী।

সবাইকে। বলে হাসলেন শরদিন্দু ঘোষাল। অনেকদিন সরল রমণীর অল্পবয়সী হাসি তিনি দেখেন নি।

এবার বানিয়ে বানিয়ে বললেন, ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুচ্ছো।

থামুন। আমরা ঘুম থেকে উঠেই আপনাদের মত মুখ ধুই না দাদাবাবু।

দাঁড়াও দাঁড়াও। সবটা শোনো। তোমাদের খোকা খুকুরা খেলতে নেমে পড়ে উঠোনে। দূরবীনে সব দেখা যায়।

তাই বুঝি। বলেই থেমে গেল রানী। আমার ছোটোখোকার খুব অসুখ দাদাবাবু।

কবে থেকে? বলোনি তো। বৌদিমণিকে বলেছো?

না। সে কথাই তো আপনাকে সেদিন বলতে যাচ্ছিলাম।

বললে না কেন? আলো জ্বলে উঠতেই—

আলোতে—একতলায়—আপনার সঙ্গে কথা বলছি। কেমন যেন লজ্জা লাগলো।

আমার সঙ্গে কথা বলতে তোমার লজ্জা লাগে রানী?

রানী মাথা নামালো। সেই অবস্থাতেই বললো, যাই, চা করে আনি আপনার জন্যে—।

চলে যাচ্ছিল। থামালো শরদিন্দু। শোনো। তোমার মিস্ত্রীর কোন ঢাকাঢাকি নেই কিন্তু। সারা তের নম্বরের কাজের মেয়েদের লেলিয়ে দিয়েছিল আমার দিকে।

রানী ঘুরে দাঁড়িয়ে শরদিন্দুর শক্ত চোয়াল দেখতে পেল। কি বলছেন? আমি তো কিছু জানিনে।

সুশীল সরদার যত অপারগই হোক—সুবালা সরদার যদি প্রশ্রয়ের হাসি (যার কোন সাক্ষী নেই অবশ্য) হেসেও থাকে—তবুও কি একজোড়া পুরুষের বলাৎকারের অধিকার জন্মায়? না হয় রক্তের ভেতর পলকের ভূমিকম্পে তাও ঘটে যেতে পারে।—তাই বলে একদম খুন। খানিক আগের ভোগের জিনিসকে প্রাণে মেরে ফেলতে হবে? অপ্রাপনীয়। প্রাপনীয়। শেষকালে এই দশা।

জাসটিস ঘোষাল নিজের হাতে খসড়ার শেষ লাইনে লিখলেন, টু বি হ্যাণ্ডড্ আনটিল ডেথ্।

আজ রবিবার। আশ্বিনের পরিষ্কার নীল আকাশ। জানালার এগারোতলা নিচের কলকাতা কয়েকটা অল্পবয়সী রাধাচূড়ো গাছ নিয়ে মশগুল। এখান থেকে লাল ফুলে বোঝাই ওদের মাথা দেখা যায়। তাদের ফাঁকে ফোকরে দু'একটা দেশলাই বাক্স মোটরগাড়ি। শেষ সেনটেনসের নিচে নাম সই করলেন শরদিন্দু। এবার টাইপ হতে যাবে। খুব গোপনে।

বাবু। টেবিলটা যদি ছেড়ে দ্যান।

আজও কাজে লেগেছো মিস্ত্রী। রবিবার ছুটি করলে পারতে।

সব কাজ শেষ করে একেবারে তিনদিন টানা ছুটি করবো বাবু। টেবিলটা ছ্যান তো।

দেখছো লিখছি।

ওই তো পাতা শেষ করে দেছেন। আর তো লেখবেন না।

কি লিখছি বলো তো?

আমরা মুখ্যু লোক। টেবিলটা ছ্যান।

শরদিন্দু দেখলেন, জগাইয়ের কথায় বার্তায় অনুরোধ যেমন আছে, তেমনই আছে আদেশ। চোরা আদেশ। ঠোঁটের কোণ দিয়ে বিদ্রূপের হাসি। তাই মনে হোল শরদিন্দুর। অনুরোধ যদি না রাখো তো তবে গুমোর একদম ফাঁক করে দেব। এই লোকটাই তার ওপর ঠিকে ঝিদের লেলিয়ে দিয়েছিল।

জগাইমিস্ত্রী একহাতে বেড়ালছানা করে টেবিলটা ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। শরদিন্দু তাকে দেখলেন। মোটা মোটা পায়ের গোছ। গায়ে একটা মিলিটারি শার্ট। সুবিধার জন্যে হাত দু'খানা কেটে নিয়ে ফতুয়া করে ফেলেছে। টেবিল ঝোলানো হাতখানা পাতাল রেলের দু'ভাঁজ কোন ছোট ক্রেন। ওকে আমি ট্রেসপাসে ফেলতে পারি। ফেলতে পারি অ্যাডালটেরিতে। লোকাল থানা ঠিক হাজির করিয়ে দেবে আদালতে। ব্যভিচার? না, অনধিকার প্রবেশ? কোন ধারায় ফেলবো? থানাকে যদি বলি, শনিবার অ্যারেস্ট করবেন। বিকেলের দিকে। শনি আর রবি—দু'রাত পুলিশ কাসটোডিতে রেখে আচ্ছা করে পেটাবেন। সোমবার ফার্স্ট আওয়ারে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেবামাত্র যেন গল গল করে অপরাধ কবুল করে।

তাহলে সবদিক রক্ষা হয়। শরদিন্দু মনে মনে বললেন, ইটিই পালের গোদা। ঠ্যাঙানিই এর পক্ষে সর্বরোগহর। একথা ভেবেও নিজেকে বড় অসহায় লাগলো জাসটিস ঘোষালের। সে তো নিজহাতে ওকে পেটাই করতে পারবে না। একজন বিচারপতির

হাতে পেটাই হলে—সে লোক তো রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যায়। তখন তো কানাকানি শুরু হয়ে যায়। নিজের মনের অপমান বা জ্বালা—পুলিশের হাত দিয়ে পেটাই করেও কি উশুল হবার? সেখানেও তো একটা হেরে যাবার ব্যাপার থাকছে।

উপরন্তু আমি কি জগাই মিস্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি লড়াই করে পারবো? জিততে পারবো? জগাইকে চ্যালেঞ্জ করলে ও তো আত্মরক্ষার জন্যেও প্রথমেই তুরপুনের ডাণ্ডাকাঠি আমার কাঁধে ভাঙবে। হাত দু'খানা ক্রেন করে নামিয়ে দেবে আমার কাঁধে। তারপর তুলে ধরে আছাড় দেবার চেষ্টা করবে।

তার চেয়ে যদি আদালতে একবার হাজির করতে পারি—তাহলে আইনের জালে ফেলে দিয়ে মিস্ত্রীকে আমি খাবি খাওয়াবো। উকিলের পয়সার জাল কেটে কোনদিনই বেরোতে পারবে না জগাই।

কিন্তু কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েই যদি বলে—ওই যে দেখলেন জজসাহেবকে—উনিই আমার বউয়ের ওপর জুলুম করার চেষ্টা করেন। ডাকুন ওঁর ধর্মপত্নীকে। তিনিই আমার পয়লানম্বর সাক্ষী। তিনি হলফ করে বলুন। কে তুষা। কে কেমন চরিত্তিরের। —কে কেমন প্রবৃত্তিরের।

তাহলে সব কেঁচে যাবে।

শরদিন্দু দূরবীনটা নিয়ে জানালায় দাঁড়ালেন। গাছের ফাঁকে ফোকরে তের নম্বরের একটু আধটু দেখা যায়। ভাল করে দেখতে হলে ঝুল বারান্দায় দাঁড়ানো দরকার। তিনটে সাড়ে তিনটে বেলা। দূরবীনের কাচে তের নম্বর উঠে এলো। খানিকবাদে ওখান থেকে রানী আসবে। এসে তার জন্যে, বৌদিমণির জন্যে চায়ের জল চাপাবে।

কী দেখছেন। তের নম্বর! জগাই মিস্ত্রীর পরিবার!

কে? ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে শরদিন্দুর হাত থেকে দূরবীনটা পড়ে যাচ্ছিল। সাহস তো কম নয় তোমার—

সাহস তো আপনার দাদাবাবু! জগাই মিস্ত্রীর কচি বউয়ের ওপর জুলুম করতে যান।

মুখ সামলে কথা বলো। এটা আমার বাড়ি।

তা জানি। কি করবেন?

শরদিন্দু দূরবীন সুদ্ধ হাত নামালো। ওটাই মিস্ত্রীর মাথায় হাকড়াবে। ইস্পাতের জিভ বের করা ভারি র‍্যাদা বাঁ হাতে ডান হাতে বাটাম মারার হাতুড়ি। ডান চোখটা লাল। মিলিটারি কতুয়ার বুক পকেট থেকে তিন ভাঁজ স্কেলের খানিকটা বেরিয়ে। বেশ মারমুখী হয়েই জগাই মিস্ত্রী বললো, কি করবেন বলুন? মারবেন? থানায় দেবেন? এখান থেকে নিচে ফেলে দেবেন? সে সাবেক দিন আর নেই জজদাদাবাবু। আপনার ধর্মপত্নীকে ডাকুন না কেন একবার।

তোমার কথা মত ডাকতে হবে নাকি আমায়!

তা নাহয় একটু ডাকলেন। তিনি তো সবই জানেন। তাকেই এক নম্বর সাক্ষী ডাকুন।

সে তো আমি ঘাট মেনেইছি জগাই।

ঘাট মানলেন—আর অমনি সব ধুয়ে সাফ হয়ে গেল। আমাদের তের নম্বরের কোন ইজ্জত নেই নাকি।

আমায় কি করতে হবে?

পঞ্চায়েত বসবে। আপনি সেখানে হাজির থাকবেন।

জজ হওয়া ইস্তক শরদিন্দু ঘোষালের কখনো কোন বিচার হয়নি। জুডিসিয়ারি থেকে খুব কমই হাইকোর্টে আসা যায়। তাও এত অল্প বয়সে। কিন্তু শরদিন্দু ঘোষালের জন্যে সুপারিশ প্রথম বারেই রাষ্ট্রপতির সায় পেয়ে যায়। নিজের বিবেকের কাছে কখনো কখনো শরদিন্দু নিজের বিচার করতে চেয়েছেন। আমি কেমন স্বামী? আমি কেমন বাবা? আমি কেমন বিচারপতি? আমি কেমন নাগরিক? এইসব আর কি। এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। পঞ্চায়েতের কথায় তার

মেরুদণ্ডের একখানা চাকতি খুলে গেছে টের পেল শরদিন্দু। সেখান থেকে এক অজানা ষড়যন্ত্রের চুলকুনি তার হাড়ের গোড়া চুলকে চুলকে কুরে খাচ্ছিল। সাহস জড়ো করে শরদিন্দু বললো, পঞ্চায়েতটা বসছে কোথায়? কবে? কারা আমার বিচার করবে?

কেন? তের নম্বরের উঠোনেই পঞ্চায়েত বসছে। বুধবার সন্ধেবেলা। পাঁচ মাথা একত্র বসে যেমন বিচার করে তেমন হবে।

যদি না যাই জগাই।

যেতে আপনাকে হবেই। নয়তো ওরা এসে নে যাবে। সেই কাজের মেয়েরা! পঞ্চায়েতে আপনাকে ওদিন নেমন্তন করতে সবাই নাইন করে আসবে দেখবেন।

শরদিন্দু বুঝলেন, এটা অনুরোধের আলোয় আসলে একটা কড়া আদেশ। হাজির থেকো সময়মত। নইলে ঘাড় ধরে হিড়হিড় করে নিয়ে যাওয়া হবে।

ওই বোধহয় নীপা এলো। পেলমেট না কি আনতে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল। যাবার সময় বলে যায়—মিস্ত্রীটা বড্ড ফাঁকিবাজ। চোখ রেখো কিন্তু।

কলিং বেল শুনে পাকা অভিনেতার মত বেতের হেলান চেয়ারে বসলেন শরদিন্দু। তারপর গৃহস্বামীর আদেশের গলায় চেঁচিয়ে বললেন, যাও তো জগাই। দরজাটা খুলে দাও। বৌদিমণি এলো বোধহয়—

এই বৌদিমণির অর্ডারে একদম হওয়া কাজ ভেঙে দিয়ে ফিরে আবার শুরু করতে জগাই মিস্ত্রীর এদানী খুব ভালো লাগে। যেমন গলার স্বর—তেমনি ফর্সা পা।

॥ ৭ ॥

ডাক্তার এক্সরে দেখে বললো, প্রেসকৃপশন আছে ?

রানী ভয়ে ভয়ে বললো, হাসপাতালের এই কাগজখানা শুধু। আর আপনার হাতে ওই পায়ের ছবি—

রানীর হাত থেকে কাগজখানা নিয়ে শরদিন্দু ঘোষাল এগিয়ে দিল ডাক্তারের হাতে। রানীকে আসতে বলেছিল ঠাকুর কালীবাড়ির সামনে। ছোটোখোকাকে কোলে নিয়ে। বেলা চারটেয়। সেখান থেকে ড্রাইভার গিয়ে তুলে এনেছে। শরদিন্দুর চেনা ডাক্তারের কাছে। তিনি নিজেই আগে এসে চেম্বারে ডাক্তারকে বলে এসেছিলেন। অভাবী মানুষ। ছেলেটাকে দেখে বলুন—কী চিকিৎসা দরকার।

ডাক্তার বললো, এত ব্র্যাডিস্ অ্যাবসেস্। সামান্য অপারেশন করে দিলেই সেরে যাবে। রানীর দিকে তাকিয়ে ডাক্তার বললো, একটু কাটতে হবে। তাহলেই ঠিকঠাক হয়ে যাবে। কোন ভয় নেই।

হাসপাতালেও তো তাই বলেছিল। অ্যাত্‌টুকু ছেলে আমি কাটতে দেব না।

কোন ভয় নেই রানী। বলে শরদিন্দু ডাক্তারকে বললেন, না কেটেকুটে কোন রাস্তা নেই ডক্টর ?

আমি তো দেখছিনে জাস্টিস ঘোষাল।

বোঝেনই তো। এরা কাটা ছেঁড়ায় ভয় পায়। পিছিয়ে যায়। মাঝখান থেকে খোকাটি জন্ম খুতো হয়ে থাকবে। অথচ ওর তো কোন দোষ নেই।

ভালো হোমোপ্যাথ দেখাতে পারেন। কিংবা কেউ যদি ধৈর্য ধরে—

গাড়ি এসে নামিয়ে দিলো ওদের—সন্ধ্যের ভিক্টোরিয়া। বেড়াতে

আসা মানুষজনের সঙ্গে গাড়ি বা শরদিন্দু খাপ খেয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ছোটোখোকা কোলে রানী—বিশেষ করে জাস্টিস ঘোষালের পাশাপাশি হাঁটার সময় একদম মানাচ্ছিল না।

রাস্তায় গাড়ি। ভেতরে বেঞ্চে বসলেন শরদিন্দু। তুমিও বোসো।

রানী কিন্তু কিন্তু করে একটু দূরে বসলো। ছোটো খোকা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে জলের ধারে যাচ্ছিল। শরদিন্দু উঠে গিয়ে পাঁজা কোলে কাছে নিয়ে এলো।

আপনি আবার কোলে নিলেন কেন দাদাবাবু? দিন—

তাতে কি হয়েছে? আমি নিতে পারি না—

আপনার জামা ময়লা হয়ে যাবে। তারপর একটু থেমে রানী বললো, দিন আমার কোলে। ছোটো খোকাকে কোলে নিয়ে রানী বললো, বৌদিমণি জানেন? আপনি আমায় নিয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে গেলেন?

না।

এটা ভালো করেননি বাবু। হাজার হোক—আমরা তের নম্বরে থাকি। আপনার বাড়ি কাজ করি। এরপর আপনার ড্রাইভার আমায় একা দেখলে ফিকফিক করে হাসবে।

তাহলে ওর চাকরি যাবে রানী।

আমার জন্যে কতজনের চাকরি খাবেন আপনি? এভাবে কি সিজিলমিছিল হয় বাবু?

বাবু বাবু আর কোরো না তো। আমার নাম শরদিন্দু। শরদিন্দু ঘোষাল।

জানি। তাই বলে নাম ধরে ডাকবো নাকি আপনাকে। আমি একজন ঠিকে ঝি—তা আমি ভুলি কি করে বাবু।

অনেক জিনিস তোমায় ভুলতে হবে রানী। কিংবা আমিই ভুলে যাবো। যেমন—তোমার চেয়ে আমার বয়স অনেক বেশি।

আহা! আপনার বয়স আপনি ভুলতে যাবেন কেন?

আমি যে অনেক বড় তোমার চেয়ে—

মিস্ত্রী মশাই তো আমার চেয়ে আরও বড়। তাতেই বা কি?

আমি যে হাইকোর্টে একজন বিচারপতি—সেকথাও আমার ভোলা দরকার।

জজ থাকা তো ভালো বাবু।

বাবু বাবু কোরো না তো।

বৌদিমণিকে না বলে আসা ঠিক হয়নি আপনার।

এবার থেকে বলেই আসবো। তোমার মিস্ত্রী মশাইকে নিয়ে সারাদিন অ্যাতো ব্যস্ত থাকে নীপা। কত যে কাঠের কাজ করাচ্ছে—

হ্যাঁ। ওকে খুব ভালোবাসেন বৌদিমণি।

একটু বেশি বাসছেন যেন!

কুভাব মনে আনেন কেন দাদাবাবু। বৌদিদি খুব ভালো লোক।

তোমার মিস্ত্রীও ভালো লোক!

একটু ডাকাবুকো আছে। নয়তো লোক খারাপ নয়।

খুব ভালো লোক। কাল তো আমায় পঞ্চায়েতে ডেকেছে।

আপনাকে? পঞ্চায়েতে? কোথায়! আমি তো কিছু জানিনে—

সবই জানতে হবে তোমায় রানী! কেন যে বলতে গেলে তোমার বৌদিমণিকে! তোমার মিস্ত্রীমশাইকে! নয়তো এসব ঝামেলায় যেতে হোতো না কাউকে।

ঠিক এই সময় ভিক্টোরিয়ার আকাশ থেকে বিষাদের গুঁড়ো নিচে পড়তে লাগলো। কালচে অ্যালুমিনিয়াম রঙের—বিকেলের আলো লেগে দু'একটা গুঁড়ো চিকচিক করে উঠছিল। যেমন আর কি ভিক্টোরিয়ার বাগানে ওই বুড়ো গাছগুলোর পুরনো পুরনো ডালে দয়ার গুঁড়ো নামে একরকমের কালো ময়দাপানা জিনিস লেগে থাকে। প্রায় তিরিশ বছর আগে এখানে খেলতে এসে ওসব গাছে উঠে স্কুলের বালক—তখনকার শরদিন্দুর গায়ে লেগে গিয়েছিল। সে

কি চুলকুনি। দয়ার গুঁড়ো আসলে বোধহয় স্মৃতির গুঁড়ো। তাই চুলকোয়।

শরদিন্দুর মাথার ডানদিকের সিঁথি, ঢেউ তোলা কোঁকড়া চুলে বিষাদের কুচি ঢুকে যাচ্ছিল। তিনি আঙুল চালিয়েও মাথা পরিষ্কার করতে পারলেন না। তখন বাঁ পকেট থেকে ছোট্ট চিরুনি বের করে আঁচড়াতে শুরু করলেন।

এমন সময় একটি লোক হাঁটতে হাঁটতে একদম পাশে এসে গেল। শরদিন্দুর মনে হোল, এ যেন অনেকক্ষণ ধরে তারই পাশে একদম গায়ে গায়ে হাঁটতে চাইছে। ভিক্টোরিয়ার পক্ষে বেমানান— কোথায় যেন এ-লোককে তিনি দেখেছেন। হাইকোর্টের করিডরে? নাঃ! রেকর্ড রুমের ঢাকা বারান্দার নিচে? মনে করতে পারলেন না তিনি।

দেখা হয়ে ভালো হয়ে গেল স্যার।

থমকে দাঁড়ালেন শরদিন্দু। ঢোলা হাতার পাঞ্জাবি, ছুঁচলো নাক, পায়ে রবারের পাম্প, দাগ দাগালি ভরা গাল। আমি তো আপনাকে চিনতে পারছি না।

শরদিন্দুর সঙ্গে সঙ্গে ছোটোখোকা কোলে রানীও দাঁড়িয়ে পড়েছে।

অনেকদিন আগে আমায় মর্নিংওয়াকের সময় দেখেছিলেন—

অ! তুমিই সে তাহলে—

হ্যাঁ স্যার। আপনি কোথায়! আর আমিই বা কোথায়! আমায় মারবেন বলে তাড়া করেছিলেন। বলতে বলতে লোকটা হাঁফাচ্ছিল। দম নিচ্ছিল। সমানতালে হাঁটবার জন্যেও তৈরি থাকছিল।

চিনেছি।

আজ আপনি তাড়া করলেও আমি দৌড়োবো না। যা হয় হবে।

বটে।

আজ্ঞে হ্যাঁ! আমার কোন উপায় নেই স্যার। আপনি একজন মহামান্য বিচারপতি। আমি একটা অর্ডিনারি লোক। তারপর হোল গিয়ে যেখানে আমার জামাই জড়িত।

কে জামাই?

আজ্ঞে টাইমকিপার নিতাই দস্তিদার! আমার বড়জামাই।

শরদিন্দু আরও থমকে গেলেন। রানী অবাক হয়ে তাকিয়েছিল লোকটির দিকে। তাকে বললেন, ওই তো গাড়ি দাঁড়িয়ে। দেখতে পাচ্ছো রানী।

হুঁ।

ড্রাইভারকে বলা আছে। তোমায় জায়গামত নামিয়ে দেবে।

কী দরকার। আমি ট্রামে চলে যাবো।

এখন অফিসভাঙা ভিড়। বাচ্চা নিয়ে তো উঠতেই পারবে না। যাও—

আপনি?

আমি পরে যাচ্ছি। সনাতনকে বোলো, তোমায় ছেড়ে দিয়ে এসে আমায় যেন তুলে নিয়ে যায়।

রানী অনেকটা এগিয়ে যেতে শরদিন্দু লোকটির দিকে ফিরে তাকালেন। তার চেয়ে বছর দশেকের বড় হবে। কাঁধের হাড় জামার ওপর দিয়ে জেগে। একই সঙ্গে বিনয়ী আর উদ্ধত—এই ভাবটায় লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। কিছু মরীয়া ভাব।

নিতাই দস্তিদার একটি ক্রিমিনাল। টাইমকীপার হিসাবে সে তার বাস কোম্পানীকে ফাঁকি দিতো। জাল টিকিটের কারবার ছিল তার। ঘটনাস্থলে পৌনে তিনশো টাকার জাল টিকিট পাওয়া যায়। হি ইজ অ্যা হার্ডকোর ক্রিমিনাল। হাঁটতে হাঁটতেই বলছিলেন শরদিন্দু। কোথাও দাঁড়িয়ে বললে, তিনি যদি কারও শ্রুতির ভেতরে পড়ে যান। এবার কিন্তু তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন—রাগে দাঁতে দাঁত ঘষে গেল। এই যে এভাবে আমায় দাঁড় করিয়ে বিচারের গতি

নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করছেন আপনি—এও এক গুরুতর অপরাধ—পরিণাম যা হবার—তার চেয়েও গুরুতর কিছু হবে। বিচারপতি হিসেবে এরকম ঘটনায় আমি চোখ বুজে থাকতে পারি না।

ঠা ঠা করে হেসে ফেললো লোকটি। আর কি গুরুতর করবেন স্যার। ফাঁসির অর্ডার তো দিয়ে বসে আছেন।

আপনি কি করে জানলেন?

লোকটি তখনো একদম মরীয়া। চোখের দৃষ্টি তেমন সুস্থ নয়। নিজেই বলতে লাগলেন, আমি নিজে স্যার আপনার ডিপার্টমেন্টে কাজ করি।

কোথায়?

রানাঘাট কোর্ট। সেকেণ্ড মুনসেফের পেশকার আমি স্যার। কিছু লুকোবো না স্যার আপনাকে। যে শাস্তি হয় দেবেন।

ধমকে উঠলেন শরদিন্দু ঘোষাল। আপনি কি করে জানলেন বলুন?

আদালতে ঘুষের রাস্তা আমাদের চেয়ে ভালো কে জানে বলুন। আপনিও তো কম বয়সে ছোটো আদালতে কাজ করে এসেছেন স্যার। আমি সব জানি স্যার. আপনার সব খোঁজ নিয়েছি। আমাকে তো আমার জামাইকে বাঁচাতে হবে স্যার। আমার বড় মেয়ের জীবনের দিকটা একবার ভাবুন স্যার। সে বেচারী বাকি জীবন কাটাবে কি করে।

অন্ধকার একটু একটু করে বিষাদের গুঁড়োগুলো শুষে নিচ্ছিল। সেই সঙ্গে এলো বৃষ্টি। একজন হাইকোর্ট জজ লোয়ার কোর্টের এক ঘুষখোর পেশকারকে অন্ধকারে. বৃষ্টিতে প্রায় বগলদাবা করে ভিক্টোরিয়ার সাদা পাথরের একটা প্যারাপেটের নিচে এসে দাঁড়ালেন। মোট কত ঘুষ লাগলো?

বিরাশি টাকা আর এক হাঁড়ি পান্তুয়া। রানাঘাটের পান্তুয়া। আমি কোর্ট কামাই দিয়ে রানাঘাট থেকে প্রায়ই আসি—আপনাকে ধরবো বলে। আমার যে উপায় নেই স্যার।

অন্ধকারে কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছিল না। নিরেট অন্ধকার —শূন্য বাগান। পাহারাদার দেখতে পেলে দু'জনকেই বের করে দেবে।

শুনছিলেন আর গুম হয়ে যাচ্ছিলেন শরদিন্দু। বেআইনী। বেআইনী। ডবল বেআইনী। আইনের গতিরুদ্ধ করার চেষ্টা। গুরুতর অপরাধ। জামাই নিতাই দস্তিদার হার্ডকোর ক্রিমিনাল না হলে অত দ্রুত ধর্ষণ করতে পারতো না। সে-ই প্রথম সুবালাকে রেপ করে।

বুঝলেন কি করে স্যার?

আপনি আদালতে আছেন—আপনার জানা উচিত। আসামীরা যখন বুঝতে পারে—কোন নিস্তার নেই—আইনের শাস্তি মাথা পেতে নিতেই হবে—তখন একজন অন্যজনের ওপর দোষ চাপিয়ে বের হয়ে আসার চেষ্টা করে। এখন দস্তিদার শিকদার—দু'জনেই তাই করছে। ফলে আদালত ওদের কথা থেকে ভেতরের অনেক প্রমাণ—তথ্য পেয়ে যাচ্ছে—যা আগে জানা ছিল না।

আমার মেয়ে কিন্তু নিতাইকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলো। ওদের তিনটি বাচ্চা এখন। বড়টি খুকী স্যার।

ওকথায় একদম গেলেন না শরদিন্দু। ধর্ষণেও থামেনি। সুবালাকে খুন করেছে নিতাই—শিকদারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে।

ওই শিকদারটাই যত নষ্টের গোড়া স্যার। খোঁজ নিয়ে দেখুন—ওর পরিবার তিষ্ঠোতে না পেরে ছুটে গেছে। দিন না—ওকেই ফাঁসি দিন স্যার। নিতাইকে আপনি ইচ্ছে করলেই বেকসুর খালাস দিতে পারেন স্যার। দিন না স্যার। এই আপনার পায়ে পড়লাম স্যার। আপনার ইচ্ছে হলে সব ভালোয় ভালোয় উৎরে যায় স্যার।

না। তা হয় না পেশকারবাবু। সুবালা সরদারের কথাটা একবার ভাবুন তো। সেও তো আপনার মেয়ের বয়সী ছিল। তারও তো সাধ আহ্লাদ ছিল।

যা হবার তা হয়ে গেছে। সে তো আর আপনি বা আমি ওলটাতে পারবো না। তবে মেয়েটি বোধহয় ভালো ছিল না।

কি করে বুঝলেন ?

প্রশ্রয়ের হাসি হাসতো পরপুরুষ দেখলে।

সে তো আপনাদের অনুমান।

না না স্যার—সুবালা খুব লোভানী দিতো পুরুষদের—

লোভানী ? সে কি জিনিস ?

লুভানী স্যার জানেন না ? পরপুরুষ দেখলে লোভ দেখাতো।

প্রমাণ করতে পারবেন ?

খুব পারবো স্যার। ওর স্বামী সুশীল সরদার—সেই যে মিষ্টির দোকানে কাজ করে—তাকে আঠারোশো টাকা দেবো বলেছি। দরকার মত সে সব বলবে স্যার। সব কবুল করবে।

অ্যাতো টাকা কোথায় পাবেন ?

একজন পেশকার যেখানে পায় স্যার।

গুম হয়ে গেলেন শরদিন্দু। এরকম একজন ক্রিমিন্যালকে আপনার মেয়ে সব জেনেশুনেও আবার গ্রহণ করবে ?

না করে উপায় কি স্যার ? স্বামী তো ! তারই তো বাচ্চা পেটে ধরেছে ! তারই সিঁদুর সিঁথিতে। আর আপনি যদি রাজি না হন তো অন্য কোর্টে মামলা ট্রান্সফারের আপিল করবো।

কোন্ যুক্তিতে পেশকারবাবু। এত সোজা ?

কঠিন জানি স্যার। তাইতো ওই মেয়েটি সমেত আপনার ফটো তুলিয়েছি একটু আগে।

ফটো তুলিয়েছেন ? তারপর আমাকেই অ্যাপিল করছেন।

উপায় কি স্যার। যদি সোজা আঙুলে না হয় তাহলে—

তাহলে আমার চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন হলে আদালতে ফোটো দাখিল করবেন তো।

দরকার হলে করবো স্যার। আর আপনি যদি দয়া করেন তো কিছুরই দরকার পড়ে না।

॥ ৮ ॥

তের নম্বরে একা একা পৌঁছতে একটুও কষ্ট হয়নি শরদিন্দুর। আজ বুধবার। পেয়ারাতলায় এসে বুঝলেন, হ্যাঁ। আজই পঞ্চায়েত বটে। তবে যেন তার চেয়েও কিছু বেশি। তের নম্বরে এখন বুঝি কারও বিয়ে।

জগাই মিস্ত্রী দেখতে পেয়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো। এসে গেছেন। কি ভাগ্যি আমাদের।

আলো কোথায়? লোডশেডিং বুঝি!

এইমাত্র হোল। হ্যাজাক জ্বেলে দিচ্ছে।

কুয়োতলা একটু পরে হ্যাজাকের আলোয় ফুটে উঠলো। দূরবীনে যেমন দেখেছেন—ঠিক তেমনটি। পাশেই সেই পেয়ারাতলা! ঘরে ঘরে অন্ধকার। খানিক আলো। সাবালক সাবালিকার চেয়ে নাবালক নাবালিকার সংখ্যাই বেশি।

এখানটায় বসুন।

চেয়ার আনিয়েছো। বাঃ। সামিয়ানাও?

বৃষ্টি পড়তে পারে দাদাবাবু। বিভু ডেকরেটরের ত্রেপল রিফু করতে এনেছিল। তাই টানিয়ে দিলাম—

হ্যাজাকটাও এখানেই টানিয়ে দাও। বলেই সহজ হবার চেষ্টায় শরদিন্দু চারদিক তাকালেন। তাকে দেখতে উঠোন ঘিরে চারদিকের বারান্দায়—সি এম ডি-এর বানানো পাকা রাস্তায় মানুষজন বসে। যেন মেলা লেগেছে। মেয়েরাও বাদ যায়নি। খানিক দূরের গুরু-সদয় দত্ত রোড এখন এখানে অলীক।

ভিড়ের ভেতর কজন কাজের মেয়ের সঙ্গে রানীও বসে। দিব্যি একখানা তোলা কাপড় পরেছে। সেই সঙ্গে জুৎসই খোঁপা। কে

বিশ্বাস করবে—একজন হাইকোর্টের জজ, পুলিশ বা আইনের আশ্রয় না নিয়ে আজ এখানে ওই মেয়েটির জন্যে সেধে অপমান মাথায় নিতে এসেছে। নয়তো জাগাই মিস্ত্রীর ধমক সে কি পরোয়া করার লোক। অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে খুঁচিয়ে সে কি তের নম্বরের ওপর লেলিয়ে দিতে পারতো না। খুব পারতো।

দু'জন লোক ধরাধরি করে একখানা কাঠের পাটাতন পাতলো কুয়োর মুখে। তার ওপর বসলো বুড়ো মত একজন। বেশ গাট্টাগোট্টা একগাল দাড়ি। মাথাটি আস্ত টাক। সে আসন করে বসতেই অনেকে চেঁচিয়ে তাকে স্বীকার করলো, অনেকটা যেন সম্মানের স্বীকার।

শরদিন্দু শুনলেন, কনেস্টবলদা। ও কনেস্টবলদা।

সে-ডাকে আসন-করে বসা টেকো স্রেফ হাত তুলে মাথা ঝেঁকে জবাব দিল। তারপর খুললো মুখ। এই যে দেখছো চেয়ারে বসে ভদ্দরলোকটি—ইটি একটি কাজ করে বসে আছেন।

কে একজন চেঁচিয়ে উঠলো, বিত্তান্তে যেয়ে কাজ নেই।

আর দু'জন অমনি বললো, না কনেস্টবলদা। মামলাটা কি খুলে বল। এমনি তো আর দুখীর শাস্তি হয় না।

মাথা নুয়ে পড়ার কথা ছিল শরদিন্দুর। কিন্তু তিনি যেন এর বাইরে। টিকিট কেটে সিনেমা দেখছেন বসে বসে। ত্রিপলের নিচে আলাদা একটা চেয়ারে। চারদিক নিঃশব্দ। গুঁড়োগাড়া বুড়োবুড়ি ছোঁড়া মিলিয়ে তা নাহোক সত্তর আশি জন হবে। এর ভেতর শরদিন্দুর চোখ আবার রানীতে গিয়ে আটকে গেল।

হ্যাজাকের ফোঁসফোসানী। তার ভেতর রানী গাল ফিরিয়ে কার কথায় ঝকমকে দাঁত হাসলো। মেয়েলোক নরম না কঠিন কে জানে। এইমাত্র তিনি রানীর ফেরানো ঘাড়ে পড়ে থাকা খোঁপায় একটি সাদা ফুলও দেখতে পেলেন। আমার এমন অপমানেও লোকে ফুর্তি করে ফুল গোঁজে খোঁপায়। আশ্চর্য!

এবার পুরো চেহারাটা মালুম হোল শরদিন্দুর। সবাই মুখিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। একবার যেন রানী তার ওপর ফেলা চোখের দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

কনেস্টবলদা লোকটি বেশ বলশালী। গলার জোরও আছে। তাকে সোজাসুজি শরদিন্দু বললেন, তুমি কোন্ থানার কনস্টবল?

আগে ছিলাম। এখন আর নেই।

চাকরি গেল কেন?

অত কথা বলতে নেই আসামীর। জরিমানা হয়ে যাবে।

থতমত খেয়ে গেলেন শরদিন্দু। জরিমানা কেন হবে?

দূষীর আবার বড় গলা কেন! তার তো এখানে বিচার হবে। বিচারে যা সাজা হবে—তাই মেনে নিতে হবে। পাঁচ মাথা এক করে বিচার। এ ভুল হবার নয়। লেখা শাস্তি দিয়ে থাকি আমরা।

তারপরই কনেস্টবলদার গলা চড়ে গেল। কোন থানার বরখাস্ত পুলিশ। কিংবা পুলিশ লাইন থেকে ডেজার্টার হতে পারে! হতে পারে ফায়ারিং কেসে সাজা পাওয়া পুলিশ।

বাচ্চা খোকাখুকিদের আর ধরে রাখা যাচ্ছিল না। তারা বারান্দা থেকে সি এম ডি এ-র বাঁধানো রাস্তায় এসে উপচে পড়ছিল। তার-পর দু'চারজন চেয়ারের আশপাশে ঘুরঘুর করতে করতে শরদিন্দুকে দেখতে লাগলো। বেশীর ভাগই খালি গা। বাচ্চা মেয়েদের নাকে সস্তার নাকছাবি। দু'একজন খোকার হাতে পেয়ারার জোড়া ডাল কেটে বানানো গুলতি।

কনেস্টবলদা লোকটা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে শরদিন্দুর দোষের ফিরিস্তি দিচ্ছিল। পরস্ত্রীর দিকে কুদৃষ্টিতে তাকানো। নিজে বে হওয়া মানুষ। বউ আছে। ঘরবাড়ী আছে। অভাব নেই কোন। তবে কেন পা ফসকায়?

মেয়েদের মাঝে সেজেগুজে বসা রানীও খুব মন দিয়ে শরদিন্দু ঘোষালের অপরাধের তালিকা শুনছিল।

শরদিন্দুর একবার আচমকাই মনে হোল, হাইকোর্টে বিচার ব্যবস্থাটা যদি এমন সরল হোত।

সবার মাঝখানে দাঁড়িয়ে জগাই মিস্ত্রী খুব সাবধানে সামনের পা উঁচুতে তুললো—যতটা পারে। তারপর দু'হাতে একটা বড় বটপাতা মাঝখানের দাঁড়া বরাবর দু'ফালা করে আলাদা করে ফেললো। অমনি ভিড়ের ভেতরের বড়রা একসঙ্গে চেঁচিয়ে বললো, তিন সত্যি। তিন সত্যি। একটা কথাও মিছে নয়।

জাস্টিস ঘোষাল বুঝলেন, এটা হোল গিয়ে এই পঞ্চায়েতের হলফনামা। যা বলিয়াছি—সত্য বলিয়াছি। সত্য বই মিথ্যা নয়। নিজেকে নির্দোষ ঘোষণা করে নিতাই দস্তিদারও এরকম কথা বলেছিল তার এজলাশে।

বটপাতাটি ছেঁড়ার পর থেকেই জগাই মিস্ত্রীর চোখের দৃষ্টি ভূতগ্রস্ত হয়ে গেল। সে একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থাতেই চোখ লাল করে তাকালো। আপনি আমার ধর্মপত্নীকে নষ্ট করতে চেয়েছিলেন—

শরদিন্দু দেখলেন, সে তো ডাইনী শিকারের জিনিস হয়ে পড়ছে। বলা তো যায় না—একটু পরে এই ভিড় তার সঙ্গে কী ব্যবহার করবে। শক্ত হবার জন্যে সে চড়া গলায় বললো, আমি? আমি কেন তোমার বউকে নষ্ট করতে যাবো? তার হোল গিয়ে আমি দাদাবাবু। আর আমি তো খোলাখুলি ঘাট মেনেইছি।

সে তো পরে। আগে তাকে আপনি জাপটে ধরেন নি? বলুক রানী। এই রানী?

শরদিন্দু ভাবতেও পারেননি, এতগুলো লোক একত্র করে এমন জিনিস একটা একটা করে কেউ খুলে বলতে পারে। আদালতের একটা নিয়ম আছে। আছে হিউম্যান কনসিডারেশন।

রানীকে বোধহয় ঠেলে তুলে দিতে হোল। শরদিন্দু দেখছিলেন আর টের পাচ্ছিলেন—বর্ষাকালের ভিজে বাতাস তুচ্ছ করে তার পিঠের মাঝখানে শিরদাঁড়া বেয়ে ঘামের ফোঁটা নামছে। মেয়েলোক

হয়ে একগলা ভিড়ের ভেতর রানী তার মুখোমুখি উঠে দাঁড়াতে পারলো ?

শুধু দাঁড়ালো না—বেশ ভাজা ভাজা গলায় হেসে হেসে বললো, আমার ওপর বাবুর নজর অনেকদিনের—

শরদিন্দু হ্যাজাকের আলোয় এই প্রথম ভাসন্ত গাঁদাফুল দেখতে পেলেন। কোন ফুলেরই বোঁটা নেই। রানীর কথায় কয়েকসারি মেয়েমানুষ হেসে হেসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ছিল।

জগাই মিস্ত্রী রানীর কথার পিঠে চেঁচিয়ে বললো, ওই শুনলেন তো! তারপর ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বললো, সবাই শুনেছো তো ?

কে শুনবে! বয়সের মেয়েরা ঢলে পড়ে হাসছিল। বুড়িরা বিরক্তি নিয়েও তুষ্ট মুখে শরদিন্দুর নাক, চোখ, কপাল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল।

কনেস্টবলদা লোকটা চেঁচিয়ে বললো, কী করে বুঝতে পারতে ?

রানী সঙ্গে সঙ্গে কিছু জবাব দিতে পারলো না। ভিড়ের মেয়েরা যার যেমন আবদার জুড়ে দিল! এই বলনা রানীদি! কি করে বুঝলি ? বলো না রানী বৌদিদি। বলো না—

রানী হাসছিল। সামান্য যেন টলেও গেল। সেই সুবাদে সবার সামনে দু'খানা হাত পেছনে পাঠিয়ে ভাঙা খোঁপা মজুত করে ফেললো। তারপর বললো, মেয়েরা বুঝতে পারে কনেস্টবলদা—

খুলে বল না রানী। এত গুমোর কেন বুঝিনে—

রানীকে তার পেছনের মেয়েরা কেন যেন পাশ থেকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে—তাই তো মনে হোল শরদিন্দুর। সে এখন কোন জিনিসেই পাকাপাকি চোখ রাখতে পারছে না। যা দেখছে—তাই-ই ইমপর্টেন্ট লাগছে। এক বুড়োর মুখ, ফাঁকা কলসী ঠোকরানো দিশি মোরগ, হ্যাজাকের ম্যানটেল, রানীর হাসির সঙ্গে, কথার সঙ্গে কাচের গুঁড়ো পিষে যাওয়ার মিহি শব্দ। তবু কোন এক জায়গায় শরদিন্দু তাকিয়ে থাকতে পারছিলেন না। কী একটা কী হবে কী হবে ভাব সব সময়। যদি ইলেকট্রিক আসতো।

কনস্টেবলদাই চেঁচিয়ে বললো, এটা হোল গিয়ে পঞ্চায়েত। যা বলার তা খুলে বলে দাও—

ঘরে ঝাঁট দিচ্ছি—আর বুঝতে পারছি বাবুর নজর। টেবিল মুছছি—টের পাচ্ছি বাবু আমার পেছন থেকে তাকিয়ে—

শরদিন্দু চড়া গলায় বললেন, পেছনের কাউকে দেখা যায়। চোখ আছে পিঠে?

রানী সরাসরি শরদিন্দুর চোখে তাকালো। এ-চোখে শরদিন্দু চোখ রাখতে পারলেন না। কিছু অবাক হলেন। তিন-চারদিন আগে ছোটোখোকাকে ডাক্তার দেখিয়ে তারই সঙ্গে ভিক্টোরিয়ায় গিয়েছিল রানী। তখন তো এমন তাকানো দেখেননি শরদিন্দু।

রানী পরিষ্কার গলায় বললো, পেছনের নজরও আমরা মেয়েরা টের পাই বাবু। আপনি যেদিন আচমকা পাশ থেকে জড়িয়ে ধরলেন—আমি আঁচ করেছিলাম—

বুঝতেই যদি পেরেছিলে—তবে ফাঁকা ঘরে কাজ করতে এলে বড়!

আমি যে আপনার বাড়ি কাজ করি বাবু। রাগ হতে পারে, কাজ তো সারতে হবে। নইলে বৌদিমণি যদি টিকটিক করেন।

শরদিন্দু মাথা নামালো। জগাই মিস্ত্রী তাকে ও অবস্থায় বেশিক্ষণ থাকতে দিল না। আবার চেঁচিয়ে বললো, আপনি রানীর গালে গাল ঘষতে গিইছিলেন? কিনা! সত্যি কথা বলুন।

আমি তো অনেক আগে ঘাট মেনেইছি জগাই।

রানী দাঁড়ানো অবস্থাতেই তার জগাই মিস্ত্রীকে ধমকালো। ওসব কথা আবার তুলছো কেন?

তুই থাম। আমরা পুরুষরা যেখানে কথা বলছি।

রানী পিছপাও হবার পাত্র নয়। সেও পা ঠুকে বললো, আমি তো সবটাই চেপে যেতে পারতাম।

সে তোর ভালোমানষী!

মিস্ত্রীমশাই। আমিও তো ঘাট মেনেইছি।

কে একজন বললো, কনেস্টবলদা। এবার সাজাটা ঠিক করে ফেলো সবাই মিলে।

দু'ধার থেকে দু'জন বয়স্ক লোক গম্ভীর মুখে গিয়ে কনেস্টবলদার দু'পাশে বসলো। কুয়োর ওপর কাঠের ঢাকনা এখন তিন বিচারপতির সিংহাসন। বিচারের রায় শুনতে সবাই এখন উৎকর্ণ, চুপচাপ। দূরে বড় রাস্তায় স্পিডে মোটর বাঁক নেওয়ার অস্বস্তিকর আওয়াজ। নীপা হয়তো ভাবছে—হাটতে বেরিয়ে জজসাহেব এখনো ফিরলো না কেন?

কনেস্টেবলদা কুয়োর ঢাকনাকাঠের ওপর উঠে দাঁড়ালো। এই ঢাকনার ওপর তিন দুপুর জগন্নাথ হয়ে থাকতে হবে। হাঁটু ভেঙে। বৃষ্টি হলে বৃষ্টি। রোদ উঠলে রোদ।

এবার বাচ্চারাই বেশি হৈ-চৈ করে হেসে উঠলো।

থাম। থাম সবাই। জগন্নাথ হয়েই দু'হাতে দু'টি বটপাতা ঝুলিয়ে রাখতে হবে আগাগোড়া।

ও কনেস্টবল। ও আমি পারবো না। মাথা ঘুরে পড়ে যাবো।

তুলে আবার বসিয়ে দেব। মজা করার সময় মনে ছিল না!

তখন অ্যাতো সব ভাবিনি। কে-ই বা ভাবে! কথা বলছিলেন আর রানীকে দেখছিলেন শরদিন্দু। হাসিতে তেজ আর আরাম ফুটে ফুটে উঠছে। তার জন্যে এ সাজা যেন রানীরই জয়—এই ভাবেই হাসছে মেয়েটা। কুদো মত হাঁটু তুলে আনন্দে একটা উপুড় করা মাটির গামলার ওপর বসে পড়ে জগাই মিস্ত্রী হাসছে আর গামলায় ডান হাতের থাবড়ায় ঢোলের বোল তুলছে। এসব দেখতে দেখতে একসময় জাস্টিস ঘোষালের মনে হোল, এরা এতখানি হিংস্র? আইনের প্রধান কথাটা কিন্তু বিচারের নামে প্রতিশোধ নয়। কোন কোন জায়গায় সংশোধন। কোথাও বা পুনর্বাসনের রাস্তা রেখে তবে

শাস্তি। কোথাও কোথাও অবশ্য এমন সাজার ব্যবস্থা থাকে—যা দেখে অন্যরা আর ও কাজ করবে না। যেমন—ফাঁসি।

জগাই দাঁড়িয়ে উঠলো। 'পঞ্চায়েত তখন ভাঙার মুখে। কনেস্টবল। জগন্নাথ আমি হতে পারবো না।

সবাই ঘুরে দাঁড়ালো। বিশেষ করে যারা ভিড় ভেঙে চলে যাচ্ছিল।

কী মনে হোল কনেস্টবলের। সে বললো, তাহলে একপাটি স্যাণ্ডেল মুখে করে হামা টেনে এখান থেকে বাড়ি ফেরা চলবে?

পাগল হয়েছো!

তাহলে কি নিজের সাজা নিজে ঠিক করবে!

মেয়েদের একজন উঠে দাঁড়িয়ে বললো, তাহলে সারা তের নম্বরের উঠোন, বারান্দা—তিন তিনবার মুড়ো ঝ্যাটা দিয়ে ঝাঁট দাও।

ওসব আমি পারবো না। ও জগাই। জগাই মিস্ত্রী—আমি কি কোনদিন ঝাঁটপাট দিয়েছি? এমন একটা কিছু বলো—যা আমি পারি।

যা বলবো—পারবেন? বলতে বলতে জগাই মিস্ত্রী মাটির গামলা থেকে উঠে এলো। ওটা বোধহয় তের নম্বরের এঙ্গমালি কাপড় কাচার বাসন।

পারতে হবে আমায়। আর কি করতে পারি জগাই।

জগাই কনেস্টবলের দিকে তাকালো। কনেস্টবল তখনো কুয়োর ঢাকনার ওপর দাঁড়িয়ে। জগাই কনেস্টবলের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে বলতে শরদিন্দুর দিকে ফিরে এলো: সারা তের নম্বরের সববাই একসন্ধ্যে পেট পুরে খাবে। আপনার সব সাজা মকুব করে দিল পঞ্চায়েত। এই দণ্ডে তিনশো টাকা জরিমানা দিতে পারবেন?

পকেটে টাকা কিছু নিয়েই এসেছিলেন শরদিন্দু। পাঁচখানা একশো টাকার নোট। হাত গলিয়ে আন্দাজে দু'খানা নোট ভাঁজ থেকে আলাদা করে পকেটের কোণে ঠেলে দিলেন। পারবো জগাই। পারবো—

নোট তিনখানা দিতে যাচ্ছিলেন শরদিন্দু। কনস্টেবল মাথা নেড়ে বললো, উঁহু। ওভাবে হবে না। এটা একটা পঞ্চায়েত। যার ক্ষেতি হয়—তার পায়ে গিয়ে জমা দিতে হবে।

এবার জাস্টিস ঘোষাল বেঁকে দাঁড়ালেন। জরিমানা জরিমানা। তা আমি পঞ্চায়েতে দেবো। কাউকে প্রণামী দেওয়ার তো কথা নয়।

বাঃ! মেয়েটার মান পাঁচ কান হয়ে কিছুটা ক্ষয় হোল না? তার একটা পরিশোধ চাই তো। কিসে তার পুরণ হবে? জরিমানার টাকাটা রানীর পায়েই দিতে হবে।

তখনো শরদিন্দু ঘোষাল দাঁড়িয়ে। যে যার ঘরে যাবার জন্যে ভাঙা ভিড়ের ঘোরানো ঘাড়ে—একদম গোড়ায় দাঁড়িয়ে রানী। তখনো তার দাঁত, হাসি, চোখ, খোঁপায় সাদা ফুলটি ঝিলিক দিচ্ছে। কাচের গুঁড়ো মিহি করে পেষাই করার হাসি দিব্যি ঠোঁটের ফাঁকে রোল করাচ্ছে রানী। আজ কি হয়েছে রানীর? সিধে সরল তাকানো —তাতে দোফলা ছুরি। কথা বললেই ভাজা ভাজা গলায় স্বর বেরিয়ে আসবে।

এলোও তাই। পরিষ্কার গলায় রানী বলে উঠলো, ওরে চপলা, মুড়ো ঝ্যাটাটা এনে দে। তের নম্বরের উঠোন—বারান্দা সব ঝাঁট দিন বাবু তাহলে!

শরদিন্দু ঘোষাল হাতের তিনখানা নোট মুঠো করে ভিড় ফুড়ে এগিয়ে গেলেন। এর কম কদরের বাবু তের নম্বরে কোনদিন আসেনি। তাই যে-যার হুদ্দাড় সরে গেল। রানীর বাঁ পায়ের একটা আঙুলে রুপো মত কিসের আঙটি। হ্যাজাকের আলোয় শাড়ির পাড়টাও রুপোলী হয়ে পায়ের ওপর পড়েছে। ওরকম কোন জায়গায় নোটের দলাটা রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন শরদিন্দু।

তারপর ঘুরে কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা হেঁটে বেরিয়ে এলেন। মেয়েলী হাসির হররা খানিকদূর এগিয়ে দিতে এসে অন্ধকারে পোড়ো বাগানে হারিয়ে গেল।

॥ নয় ॥

সারারাত জুড়ে যেসব বৃষ্টি উল্টোপাল্টা হাওয়ার সঙ্গে দাপাদাপি করে—ভোরবেলা একঘণ্টার রোদেই তা মুছে যায়। সেরকম একটা খটখটে চেহারা নিয়ে জগাই মিস্ত্রী কাজে এলো। গায়ে সেই মিলিটারি ফতুয়া। কাঁধের ব্যাগ থেকে করাতের দাঁত বেরিয়ে। শব্দ করে বোঝাটা মেঝেতে রাখলো।

রানীর জন্যে শুয়েট করে করে আজ অনেকদিন পরে নীপা নিজের হাতে চা করে শরদিন্দুকে দিয়েছেন। মুখোমুখি বসে দু'জনে ভোরের আকাশ দেখতে দেখতে গল্পও করেছেন। এমন সময় জগাই মিস্ত্রীর আগমন। নীপা জানতে চাইলো, রানী আসবে না?

জ্বর হয়েছে। আজকের দিনটা চালিয়ে নিন বৌদি। কাল ঠিক উঠে বসবে।

সব শুনতে পাচ্ছিলেন শরদিন্দু। তিনি মনে মনে বললেন, জ্বর না আরও কিছু। যতসব ঢলানী। পিঠে দু'টো চোখ বসানো আছে—তাই দিয়ে সব দেখতে পায় পেছনে!

ওষুধ দিয়েছো?

নীপার কোন কথাতেই জগাই মাথা তোলে না। ঝোলা খুলতে খুলতে বললো, আমাদের ঘরে ওসব লাগে না বৌদিদি।

খুব হয়েছে। যাবার সময় ওষুধ নিয়ে যাবে। ঝোলায় রাখ তো ওসব।

কি হবে বৌদি?

এখন আমার সঙ্গে রান্নায় যোগাড় দেবে। তারপর কাঠের কাজে হাত দেবে।

আমি পুরুষলোক। আমি ওসব—

খুব হয়েছে। মাছ কোটা আছে ফ্রিজে। মসলা রানী মিকশ্চারে বানিয়ে রেখে যায়। গ্যাস রয়েছে। তুমি শুধু এটা ওটা যোগান দেবে। বৌদির ফাইফরমাস খাটতে ভালো লাগে না? বলতে বলতে সরু করে তাকালেন নীপা। তখন একপাল্লার দরজাটা আপনা আপনি আবজে যাওয়ায় এ কথাবার্তা থেকে শরদিন্দু আলাদা হয়ে গেছেন।

তাই বলেন! খুব পারবো। রোজ রোজ কাঠের খুটখাট করে ভাল্লাগে বলেন তো!

আজ প্রধান বিচারপতি দু'শো বছরের ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ সব দলিল দস্তাবেজের এক প্রদর্শনী পাবলিকের জন্য উদ্বোধন করলেন। সে অনুষ্ঠানে চিফ জাস্টিসের পাশাপাশি থাকতে হয়েছিল শরদিন্দুকে —আগাগোড়া! মন্ত্রী, ঐতিহাসিক, ভাইসচ্যানসেলার, জাস্টিস, অধ্যাপক, প্রেসের লোকজন—কে আসেননি।

নিশীথবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একখানা দানপত্রের কথা তুললেন। বেশির ভাগেরই শুরু—কার্যাঞ্চমিদং···এই সব দিয়ে। অতুল সুর মশায় ডেভিড হেয়ারের দানপত্র থেকে তার দাদা আলেকজাণ্ডারের বেআইনী মেয়ে জ্যানেটের কথা তুললেন। জ্যানেটকে নাকি রামমোহন রায় শৈবমতে বিয়ে করেছিলেন। জ্যানেটের বাবা মেয়ের জন্ম দিয়ে ভার নেননি ছোটভাই ডেভিডের হাতে মেয়েকে তুলে দিয়ে আলেকজাণ্ডার ভাগ্য ফেরাতে চলে গিয়েছিলেন বাটাভিয়ায়! ডেভিড হেয়ার নিজে তো বিয়েই করেনি।

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই জাস্টিস ঘোষাল করিডর দিয়ে তাঁর অ্যান্টিরুমে ফিরছিলেন। আঠারোশো কুড়ি তিরিশের ঘটনা। পাথুরে-ঘাটার উপানন্দ টেগোর খবরের কাগজে লিখলেন—বিদেশিনীর সঙ্গে রাজার কিসব সম্পর্ক আছে। আভাসে ইঙ্গিতে লেখা এই খোঁচার

জবাব দিলেন রাজা রামমোহন। পরিষ্কার ভাষায়। তাঁকে আমি শৈবমতে বিয়ে করেছি টেগোর।

এ না হয় খবরের কাগজে চাপান উতোর গেল। কিন্তু মিসেস রামমোহনের দিন কেটে ছিল কিভাবে? ১৮২০-৩০-এর আলো হাওয়া, তখনকার আকাঙ্ক্ষা ক্ষোভ, সুখদুঃখ নিয়ে পরেপ্পর দেড় শতাব্দীর আলোর নিচে, ধুলোর নিচে চাপা পড়ে গেছে। এখন আলো চুলকে তুলেও তখনকার আলো দেখা যাবে না। সে আলোয় ওদের সাধ আহ্লাদ মিশে আছে।

করিডর দিয়ে তারই পিওন ছুটে আসছিল। স্যার। একজন মেয়েছেলে বসে আছেন আপনার জন্যে।

শরদিন্দু বললেন, এখন চলে যেতে বলে দাও। এখানে কি? বলতে বলতে এগোচ্ছিলেন তিনি আর মনে মনে বলছিলেন—নিশ্চয় সেই নিতাই দস্তিদারের বউ—যার বাবা রানাঘাটে সেকেণ্ড মুন্সেফের মার্কামারা ঘুষখোর এক পেশকার।

শরদিন্দু নিজের হাঁটার স্পিড্ কমিয়ে দিলেন। পিওনকে সময় দেওয়ার দরকার। সে ঘরে গিয়ে নিতাইয়ের বউকে বের করে দেবে। বউটি চলে যাবে। তারপর তো জাস্টিস ঘোষাল তাঁর বিশ্রাম নেবার ঘরে ঢুকবেন! লম্বা করিডরের ডানহাতে খয়েরি রঙের খিলান সব। এক-একটি সিমেন্টের তোরণ—গম্ভীর, সুদৃশ্য—আইনকে খাতে সবাই সম্মান করে চলে—সোদকে লোক রেখেই এমন গঠন বাড়িটার। পৃথিবীতেই স্বর্গের ন্যায়বিচার নামিয়ে আনার জন্যে।

ঘরে ঢুকে একবার ডাক্তারকে ফোন করলেন। বড্ড ডিপ্রেসন যাচ্ছে কাল থেকে। ক'দিন ধরেই কিছু ভাল লাগছে না ডক্টর। সব সময় মনে হয় হেরে গেছি। আমার জন্যে আর কোন প্রাইজ নেই। সব স্পোর্টস্ হয়ে গেছে!

আপনাকে সুপ্রীমকোর্ট অব্দি যেতে হবে স্যার।

ওরে বাবা! আমার দ্বারা হবে না। সে তো রিটায়ার হতে আরও পঁচিশ বছর।

হ্যাঁ স্যার। সিক্সটি ফাইভে রিটায়ার করবেন—অ্যাজ চিফ জাস্টিস অব ইণ্ডিয়া।

না না ডক্টর। আমার অত অ্যাম্বিশান নেই। যা আছি তাই থাকলেই যথেষ্ট! ক্যালকাটা হাইকোর্টে আমিই সবচেয়ে জুনিয়র জাজ।

একদিন সবার চেয়ে সিনিয়র হয়ে গেছেন দেখবেন। লম্বা অনেক-গুলো বছর তো পাচ্ছেন হাতে—

বলছেন! তার মানে আমার এখন শুধু বেঁচে থাকা দরকার।

সুস্থভাবে বেঁচে থাকা দরকার আপনার। ফিরতি পথে আসুন না। চেম্বারে থাকবো। সব চেকআপের ব্যবস্থা করছি আপনার।

ভালো কথা ডক্টর—সেই যে ব্রাডিস অ্যাবসেস—খুঁড়িয়ে হাঁটতো একটি বাচ্চা—আপনি অপারেশনের কথা বলেছিলেন—

কেমন আছে?

অ্যালোপ্যাথি হোমোপ্যাথি মিশিয়ে চিকিৎসা করেন এক ভদ্রলোক—তিনি সারিয়ে ফেলেছেন।

কোনো কোনো সময় সেরে যায়।

বাচ্চাটি হাঁটছে দিব্যি। ওর মা বললো, পায়খানার সঙ্গে খারাপ রক্ত জল হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

কিওর হলেই হোল। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে—অ্যাবসেসের কোন শাঁস না থেকে যায়—তাহলে আবার হবে। আসছেন তো সন্ধ্যেবেলা—

শরদিন্দু আর কিছু বলার উৎসাহ পেলেন না। ফোন নামিয়ে রাখলেন। টেবিলের ওপর কাচের নিচে নিজের ছেলের ছবিখানার দিকে তাকালেন! বোর্ডিং লাইফ স্যুট করে গেছে ওর। নিয়মিত

দুখানা করে চিঠি লেখেন তিনি। ছেলেকে। মাসের গোড়ায় আর থার্ড উইকে। এমাসের চিঠির কোটা ফুল হয়ে গেছে।

তবু কলম বের করলেন শরদিন্দু।

'তুমি যখন বড় হবে—তখন দেখবে—তোমার আগেও অনেকে তাদের মত করে বড় হয়ে গেছেন। তাদের পৃথিবী থেকে তোমার পৃথিবী ভিন্ন। তাদের আশা আকুতির কোন চিহ্ন তোমার বাতাসে থাকবে না। কিন্তু তুমি যদি বাতাসের ভেতর সেসব আশা আকাঙ্ক্ষার চিহ্ন দেখতে পেয়ে তোমার পথ—তোমার করণীয় কাজ ঠিক করে নিতে পারো—তাহলেই তুমি তোমার যুগ থেকে একটু ওপরে উঠে সমগ্র সময়কে আঁচ করতে পারবে। দেখতে পাবে। দ্রষ্টা হবে। তোমার নিজের একটা দৃষ্টিকোণ গড়ে উঠবে। এই পৃথিবীতে শুধু বেঁচে থাকারও একটা মানে পাবে।

আমি কি কখনো তোমার চিন্তায় আসি?

ইদানীং আমার বাবা আমার মনে বার বার আসছেন। তিনি মফঃস্বলের আদালতে সফল ফৌজদারি উকিল ছিলেন। প্রভূত প্রসার ছিল তাঁর। এখনকার অনেক ল-ইয়ার তাঁর প্র্যাকটিস দেখলে নিশ্চয় ঈর্ষা করতেন। অবসর সময়ে বাবা এস্রাজ বাজিয়ে গাইতেন।'

কলম বন্ধ করলেন শরদিন্দু। পিওনকে ডাকলেন। ড্রাইভারকে বলো—আর ব্যাগ দিয়ে এসো। এই চিঠিখানা ডাকে দিতে হবে। স্ট্যাম্প লাগিয়ে নাও।

আজ একটু আগেই বেরোচ্ছিলেন শরদিন্দু। এখন কেল্লার পাশ দিয়ে যেতে যেতে বর্ষায় ভিজে গাঢ় সবুজ মাঠ থেকে রং তুলে নেবেন চোখে। কে?

মাথার ঘোমটা টেনে পেছন ফিরে দাঁড়ানো। পিওন বললো, এই মেয়েছেলেটি আপনার খোঁজ করছিল স্যার।

তা গ্যারেজে কেন? সরে দাঁড়াতে বলো।

ড্রাইভার কি বলতে যাচ্ছিল। শরদিন্দু বললেন, আগে ডাক্তার-বাবুর ওখানে যাবো।

মেয়েছেলেটি তখনো সরে দাঁড়ায়নি। না সরলে দরজা খোলা যায় না এদিককার। শরদিন্দু তাই ঘুরে ওদিককার দরজায় যাচ্ছিলেন। তাকে থামতে হোল।

আমি রানী।

চমকে উঠলেন শরদিন্দু। ঠিকই করা ছিল তাঁর। দেখা হলে কখনোই কথা বলবেন না। বেহায়া ক্লাসের মেয়েমানুষ। শেষমেশ আদালত অব্দি ধাওয়া করেছে। জগাই মিস্ত্রীর যে কতরকমের মতলব আছে। নীপার কাঠের কাজ শেষ হলেই লোকটাকে হাজতে ঢোকাতে হবে। আর চুপ করে থাকা যায় না। পিওন, ড্রাইভার —দু'জনই তাকিয়ে। খট্ করে বলে বসলেন শরদিন্দু, ক'দিন কাজে আসছো না কেন? এখানে কি করতে?

নিজের গলাই শরদিন্দুর নিজের কানে তেমন জোরালো লাগলো না।

জ্বর তো ছাড়েনি দাদাবাবু।

মেঘভাঙা বর্ষার বিকেল। হাইকোর্টের লালচে গা বেয়ে বৃষ্টির জলের সঙ্গে কিছু আলোও নেমে আসছিল। লাল চোখ। শুকনো খোঁপা। তাতে আরও শুকনো একটা সাদা মরা ফুল। উঠে এসো তাড়াতাড়ি। বৃষ্টি পড়বে এক্ষুনি।

দরজা খুলে পাশে বসালেন রানীকে। সামনের সিটে বসা পিওনকে একটু বাদেই নামিয়ে দিলেন। কাল একদম সোজা কোর্টে আসবে। এখন বাড়ি যাওয়ার দরকার নেই। গম্ভীর ড্রাইভারের চোখে চোখ রেখে আরও গম্ভীর পিওন থিয়েটার রোডের মুখে নেমে গেল।

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে পড়ে গাড়ি থামাতে বললেন শরদিন্দু। নিজে স্টিয়ারিংয়ে বসে ড্রাইভারকে বললেন, কাল এসে কোর্টে নিয়ে যাবে।

এরপর ফুয়েলের কাঁটাটা দেখে নিয়ে গাড়ির মুখ ঘোরালেন তিনি। আর মনে মনে এই কথাগুলো চিবিয়ে চুইংগাম করে ফেললেন—অন্তঃপুরিকা, অসূর্যম্পশ্যা, প্রেয়শী, পরিচারিকা, বাঁদি, নটী, ন্যায়াধীশ, সেনাপতি, কাজি, গুরুদেব, কুলটা, লাম্পট্য। অনেকগুলো শতাব্দী, অনেক রকমের সভ্যতা, ধর্ম, ইতিহাস, নাটক—অনেক রকমের শক্তিকে জড়িয়ে মড়িয়ে তবে না মেয়ে পুরুষের সম্পর্কের একটা কোড্ অব কণ্ডাক্ট তৈরি হয়ে গেছে আপনা আপনি।

বর্ষার কলকাতা ভালো করে দেখা যায় কোন নদীর পাড়ে দাঁড়ালে। মানোয়ারী জেটির কাছাকাছি গিয়ে গাড়ি থামালেন শরদিন্দু। সামনে এসে বোসো।

পেছনের সিট থেকে কাঁপা কাঁপা গলায় রানী বললো, আমি আপনার সঙ্গে গপ্পো করতে আসিনি।

সে তো জানিই। এমন জোর পাও কোত্থেকে বল তো? কাজের বাড়ির বাবুর অফিসে সোজা চলে আসো! আবার পঞ্চায়েতে দাঁড়িয়ে সিধে তাকিয়ে বলতে পারো—

শরদিন্দু থামানো গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে বসে ছোট আয়নায় একবার রানীর মুখ দেখার চেষ্টা করছিলেন। আবার ঘুরে বসে সিটের ওপর হাত রেখে কথা বলছিলেন। এই পোশাকের কোন মেয়েকে নিয়ে তার মত লোক কোন রেস্তোরাঁতেই যেতে পারেন না। আবার ধরাচুড়ো পরা কোন বিচারককে বৃষ্টির মাঠে বসতে পারেন? পাশে জ্বরে কাহিল রানীকে নিয়ে? তাও অসম্ভব।

সিটের ওপর হাতখানা ছিল। তাতে জ্বরে পোড়া কপালটা চেপে ধরে রানী কেঁদে ফেললো। আমি তো সে জন্যেই সাহস করে এসে পড়েছি বাবু।

কেঁদো না। উঠে বোসো। লোকজন যাতায়াত করছে। কী ভাববে দেখে—

দেখুক গে! বলে যে-মুখ তুলে ধরলো রানী—তাতে তাকাতে

পারছিলেন না শরদিন্দু। জ্বরে লাল দুই চোখ। খোঁপাটা প্রায় গুঁড়ো গুঁড়ো। সে-রাতের বাসি সাদা ফুলটা শুকিয়ে মরে আছে।

আমায় মাফ করে দিন বাবু।

ডাক্তার দেখেছে?

সময় পায়নি মিস্ত্রী। আমায় ক্ষমা করে দিন বাবু। আমি সব শুনিছি।

কি শুনেছো?

চপলা বলছিল—বলে রানী আবার কেঁদে ফেললো।

চপলা কে?

চিনবেন না আপনি। তিন বাড়ি তোলা কাজ করে। আমার চেয়ে ছোটো। জয়নগর থেকে ভেসে এসেছে প্রায় কলকাতায়। আর কথা বলতে পারলো না রানী। আবার সেই শব্দহীন কান্না। বর্ষায় ভিজে কলকাতাতেও আইসক্রীম বাক্স বেরোয়। না বলেছিলেন লোকটাকে। দাঁড়ানো জাহাজটা গঙ্গায় দাঁড়িয়ে গঙ্গাতেই একটা নল থেকে জল ঢেলে যাচ্ছে। কেল্লার সঙ্গে গঙ্গার যোগাযোগের নালাটাও ঘোলা জলে ভর্তি।

আমায় মাফ করে দেন বাবু।

বাবু বাবু করবে না। মাফ করবো কেন? সত্যিই তো তোমায় জড়িয়ে ধরেছিলাম!

সে জন্যে নয়। আমি সব শুনেছি চপলার মুখে—

চপলার মুখে কেন? তুমি তো নিজেই সব করলে! সবই তো তুমি নিজে জানো রানী!!

আমি তো আমাতে ছিলুমনি দাদাবাবু।

কি রকম?

পঞ্চায়েত আমায় তিন গেলাস চোলাই খাইয়ে দিলো যে—

কতদিনের অভ্যেস?

আগে কোনদিন খাইনি। যাতে সাহস থাকে—কথা বলতে পারি—সে জন্যে পঞ্চায়েতের হয়ে মিস্ত্রী আমায় ঢেলে দিয়ে বললো, নে খেয়ে নে। গায়ে বল পাবি। সব কিছু সাহসে কুলিয়ে যাবে। আগে কোনদিন খাইনি তো। শেষে কি করেছি—আমি নিজেই জানি না বাবু।

চপলা কি বললো ?

আমার পায়ে আপনাকে টাকা রাখতে হয়েছে—উঃ! জ্বরের ভেতর শুনছি আর এ-ক'দিন শুধু কেঁদেছি। আবার রানীর মুখখানা জ্বরে—কান্নায় তুবড়ে গেল।

পঞ্চায়েতের যখন নিয়ম তখন তুমি কি করবে? এতে কোন দোষ নেই তো তোমার রানী।

না আমি দুষী বাবু—মহা দুষী। চপলা জলধারানী দিতে দিতে আরও অনেক কথা বলেছে। আমি বিছানায় শুয়ে শুনেছি আর কেঁদেছি বাবু। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হেসেছি। আপনার কথার পিঠে কথা দিয়ে তকরার করেছি। ফোড়ন কেটেছি বুক চিতিয়ে। কি লজ্জা! কি লজ্জা বাবু!! আমি খুব দুষী। চোলাই গিলে আমার যে কি হয়ে গেল বাবু।

আর কেঁদো না। .চলো। আরেক জায়গা থেকে গঙ্গাকে দেখবো রানী। বালি ব্রিজে উঠেছো কখনো ?

না। আমি কি কোথাও গেছি বাবু! জীবনটা তের নম্বরে চলে গেল। পাঁচ বছর বয়সে এসে ঢুকেছিলাম।

অন্ধকার হয়ে যাবে। তবু সেখান থেকে গঙ্গা দেখা যাবে। একটু আবছায়া মতন।

আমি কিছুই দেখিনি জীবনে। দেখাবেন বাবু? আপনার পড়াশুনোর টেবিলে সেই কাচের নলছুটো—

দূরবীনটা ?

হু। একদিন নেড়েচেড়ে চোখে তো দিলাম।

দিয়েছিলে বুঝি? গাড়ি চালাতে চালাতে কথা চালু রাখলেন শরদিন্দু। রানী যদি তার পাশে সামনের সিটে এসে বসতো তাহলে জ্বরের আন্দাজটা তিনি পরিষ্কার পেতে পারতেন। এই খানিক আগে তাঁর নিজের বুকের ভেতরে তিনি একটা ভূমিকম্পের আন্দাজ পেয়েছেন। যে ভূমিকম্পে মেঘলা বিকেলেও অন্ধকার নদীর গা দেখা যায়। রানীর উৎসাহে যাতে ভাঁটা না পড়ে—ক্ষমা চাওয়ার কাদামাটি ভর্তি হিস্টিরিয়ায় মেয়েটা যাতে জ্বরের ভেতর ভেসে না যায়—সেদিকে লক্ষ্য রেখেই শরদিন্দু কথা চালাচ্ছিলেন—আর গাড়ি চালাচ্ছিলেন।

নলের ভেতর দেখি কি—আমাদের তের নম্বর একদম পরিষ্কার। কোন ময়লা নেই। ধুলো নেই। সত্যি বাবু। সকাল কি বিকেল বোঝা যায় না। একদম চুপচাপ—শান্ত। লোকজন ঘোরেফেরে—অথচ শব্দ নেই দাদাবাবু। প্যায়রা গাছটা অব্দি শান্ত। পাতাও নড়ে না। যেন বাতাসও বয় না—

তাই বুঝি! তা তোমাদের কনেস্টবলদা জরিমানার টাকায় সবাইকে খাওয়ালো?

খাওয়াবে কোত্থেকে? আমি যে জ্বরে পড়ে।

ডানলপ পেরিয়ে যাবার পর শরদিন্দু বাঁয়ে মোড় নিলেন। এবারে রাস্তা অল্পই। তুমি সেরে উঠলেই পেট পুরে খাওয়াবে সবাইকে।

পেট পুরে না ছাই। সে তো জানেন না দাদাবাবু—আরেকবার আরেকজনার জরিমানার টাকায় শেষে বিচেকলা আর মাদার ডেইরির দুধে সিন্নি দিলো কনেস্টবলদা। সঙ্গে বাতাসা। দেখেন—শেষ অব্দি কি হয়—

লম্বা নিঃশ্বাসে রানী হাঁফাচ্ছিল। গাড়ি শ্লো করে ঘাসের ওপর একদিক তুলে দিলেন। পাশ দিয়ে দিল্লি রোডের লরিগুলো যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। অন্ধকারের একদম কালি গড়াচ্ছে। বাতাসে ফিনফিনে

শীত। মানে বৃষ্টি আসছে! এখন কিছুতেই গঙ্গার গা দেখা যাবে না। গাড়ি থামালেন শরদিন্দু।

পেছনের সিটে এসে রানীর পাশে বসলেন। একি তোমার গা যে পুড়ে যাচ্ছে।

পুড়ুক গে।

মিস্ত্রী বাড়ি ফিরে যদি তোমায় না দেখে রানী? শেষে একটা কেলেঙ্কারি হবে।

হোক কেলেঙ্কারি। পরাদন সব শুনে তো আমার জ্বর বেড়ে গেল আরও। এ আমি কি করেছি বাবু!

কেঁদো না। বলতে বলতে শরদিন্দু অনেকদিন পরে চব্বিশ বছরের একজন মানুষকে দু'হাতে নিজের কাছে টেনে দিয়ে শক্ত করে ধরলেন। এরকম জ্বর নিয়ে তোমার বেরোনো উচিত হয়নি রানী।

আমি কি কোর্ট চিনি। জমানো ন'টা টাকা ছিল। ট্যাকসি থামিয়ে উঠে বসলাম। বললাম, হাইকোর্ট চলো। এ-ঘর সে-ঘর ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে বেরিয়ে দেখি আপনার গাড়ি। ড্রাইভারকে ধরলাম। সে দেখিয়ে দিল ঘর। সে জন্যে পান খেতে একটা আধুলি দিলাম ড্রাইভার সাহেবকে—আর কথা বলতে পারলো না রানী। হু হু করে কেঁদে ফেললো, আমার জন্যে অ্যাত্‌খানি অপমান হোল আপনার মত মানুষের বাবু।

চুপ করো তো। এখন বাড়ি ফিরবে কি করে? এই জ্বর নিয়ে যাবেই বা কোথায়?

কেন? আপনি পৌঁছে দিয়ে আসবেন।

মিস্ত্রী যদি আবার পঞ্চায়েত বসায়! এই তো তোমায় জড়িয়ে ধরে বসে আছি।

ইস্। অত সোজা? আমি তো ইচ্ছে করেই আপনার কাছে এলাম বাবু॥

মারধোর করতে পারে মিস্ত্রী।

এবার রানীই শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো শরদিন্দুকে। অন্ধকার রাস্তার পাশে মার্কফোর গাড়ির ভেতর ব্যাটারির ক্ষীণ আলোয় এই সময়টুকু তার স্রেফ অলীক বসবাস বলেই মনে হলো। জ্বরে আগেই তেতে ছিল। এবার রানী নিঃশ্বাসে ফুলকি তুলে বললো, আমি কি মিস্ত্রীর ভাতের হাঁড়ি? না, বাসন মাঝার কুয়োতলা বাবু!

তুমি তার বিয়ে করা বউ।

তাই বলে কি তার বিষয় সম্পত্তি হয়ে গেলাম বাবু!

ফিরে চলো। তোমায় আগে ডাক্তার দেখাতে হবে।

তা দেখাবেন! যত ইচ্ছে দেখাবেন!

মিস্ত্রীর ভয় নেই একটুও?

আর ভয় পাই আমি! পঞ্চায়েতের নাম করে চোলাই গেলানো। জ্বরটা সারুক না—আমি মজা বোঝাচ্ছি মিস্ত্রীর।

শরদিন্দু নিজেকে আলগা করে নিয়ে দরজা খুলবে ঠিক করলো। তারপর সামনে গিয়ে স্টিয়ারিংয়ে বসে সোজা ডাক্তারের চেম্বারে। কিন্তু ওঠা হলো না তার। অনেকদিন পরে চব্বিশবছরের একটি মানুষ নিজে থেকে তাকে জাপটে ধরলো। একটু বোসো না বাবু।

তোমার ছেলেমেয়ে রয়েছে রানী।

আছে, থাকবেও। তোমারো তো ছেলে আছে বাবু।

আমি তোমার চেয়ে অনেক বড়। আমার বয়স জানো?

তুমি তো সবদিকে বড়ো হবেই। নইলে অমন করে কেউ নোটের দলা পায়ে রাখে! চপলা সব বলেছে আমায়।

নিজেকে আর ছাড়লেন না শরদিন্দু। হুস হুস করে লরি পাস করছে। সে তো জরিমানার টাকা রানী!

উঃ! কত বড় জরিমানা! বলতে শরদিন্দুর বুকের ভেতরে থেকে রানী ফণা তুলে ওপরের দিকে উঠতে চাইলো। শরদিন্দু ততটা উঠতে দিলো না।

রানীর গালে গাল লেগে যাওয়ার কথাটা লীনার চোখে চোখ রেখে রেখে যে কারণে শরদিন্দু অস্বীকার করেছিলেন—সে কারণটা ঠিক এই মুহূর্তে স্বীকার অস্বীকারের বাইরে চলে গেল। রানীর পায়ে পা লেগে যাচ্ছিলো শরদিন্দুর। বুঝতেই পারছিলেন—পায়ে কোন জুতো নেই। তের নম্বরের বাসিন্দা। ঠিকে কাজের মেয়ে। তবু রানীকে পুরোপুরি মেয়েমানুষই লাগলো শরদিন্দুর।

সরমা

॥ ১ ॥

ইঞ্জেকশনের বাছুর বড় সেয়ানা হয়। দেড় বছর বয়স না হতেই সুধীর এখন যাকে তাকে ঢুঙোতে যায়। একবার ক্যাটেল শোতে পাঠাতে চেয়েছিল নীলকান্ত। তিনজন লোক করা হল। দুপুরবেলা হেঁটে গিয়ে বেলা তিনটের মধ্যে বাছুর নিয়ে হাজির হতে হবে। তখন বি ডি ও সাহেব প্রাইজ দেবেন। কিন্তু সুধীরকে খাল পোলের ওদিকে আর নিতে পারল না তিনজনে। নীলকান্তকে শুধু তিনটে লোকের আধবেলার মজুরি গ্যাটগচ্চা গুনতে হল।

বড় বড় তিনটে গাই থাকে গোয়ালে। একটি দোআঁশলা—বয়স হয়েছে। বাকি দুটোই মুলতানি। তাদের একজন গাভিন—একজন এবেলা ওবেলা মিলিয়ে এগারো সের দুধ দিচ্ছে। তিন বিয়োনি।

সুধীর এঁড়ে বলে সংসারে কোন সুবিধে দেয় না। তবু নীলকান্ত এই বাছুরটার গম্ভীর চোখ দেখলে মায়ায় ভুলে যায়। সব সময় কাজল পরে আছে চোখে। একটুও বাজে চর্বি নেই গায়ে। বাপ বিলিতি। সুধীরের জন্ম ইঞ্জেকশনে। হিন্দি ক্যালেণ্ডারে এই চেহারার গাইগরুর গায়ে হেলান দিয়ে কৃষ্ণ বাঁশী বাজায়।

সেই সুধীর তিনগাছা দড়ি ছিঁড়ে ফেলেছে। দিশি গাইগরুর ওপর চড়াও হয়ে প্রায়ই বিতিকিচ্ছিরি সিন করছে মাঠে। নীলকান্তর বউয়ের চারদিকে কড়া নজর। স্বামীর সঙ্গে পাশাপাশি খেটেখুটে সংসারের হাল ফিরিয়েছে। গায়ের রঙ হারালেও পুকুরের মাছ, বাড়ির সবজি, চাষের মোটা চালের ভাত আর গরুর দুধ খেয়ে বেশ ফুলেছে। সুধীরকে তার মোটেই পছন্দ নয়, তুমি বাপু লোহার চেন কিনে আনো। ছেলে মেয়ে বড় হচ্ছে।'

ছেলেমেয়ের দুধের জন্যেই গরু। অতএব নীলকান্ত আজ শেয়ালদায় নেমেই শ'কোম্পানির দোকানের পাশে দা'কুড়োলের হোলসেল কারবারীর কাছ থেকে তিন টাকা দশ আনায় দেড় কেজি-র এক চেন কিনে ফেলল।

ট্রাম বাস ট্যাক্সি কিছুই পেল না। ঘামতে ঘামতে অফিসে এসে হাজির হল। তার একটা বউ দুটো ছেলেমেয়ে, তিনটে গাই, সতেরটা হাঁস, একদাগে বারো বিঘের চাষ, সাতশো টাকা মাইনের পারমানেন্ট চাকরি, কলকাতার ৮।১০ মাইলের মধ্যে একখানা পাকা বাড়ি আর উচ্চাশা আছে।

এসব করতে গিয়ে নীলকান্ত কি কি হারিয়েছে? প্রথমেই বলা ভাল টাটকা যুবা বয়সের কেয়ার-ফ্রি ভাবটা আর একদম নেই তার। কলেজ থেকে বেরিয়ে ওইটেই ছিল তার অ্যাসেট।

চারবছর বয়সে অলেস্টার পরে একখানা ছবি তুলেছিল নীলকান্ত। সেখানা এখন তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস। সেই ছবির মুখের বাটালি কাটা নাকচোখ, মাথাভর্তি চুলের দিকে ভারিক্কি নীলকান্ত ঠাকুর্দার সস্নেহ চোখে তাকিয়ে থাকে মাঝে মাঝে। এখন সাঁইত্রিশে তার রঙ জ্বলে গেছে, মাথায় কড়া আলো ফেললে তালু দেখা যায়—নাক, চোখ, গাল মাংসে মাংসে মাত্রা হারিয়ে এদিক ওদিক হয়ে আছে। তবে, সান্ত্বনার কথা, এখনও চুপচাপ থাকলে তাকে চিন্তাশীল, হৃদয়-বান, সুশ্রী লাগে। মুখে একটা করুণ ছাপ সব সময় থাকে। ধুতি পাঞ্জাবি পরে কলকাতার বাইরে সুবিধে পেলেই নিজেকে আঠাশ উনত্রিশ বলে চালাবার তালে থাকে! কিছুকাল হল কলকাতার হোস্টেলে বড় ছেলেটিকে রেখেছে। ফি শনিবার সেখানে গিয়ে সারা হপ্তার টিফিন দিয়ে আসতে হয়। কোনদিন বউ যায়, কোনদিন নিজে। আবার জোড়েও যায়।

ডেলিপ্যাসেঞ্জার বলে নীলকান্ত তড়িঘড়ি করে অফিসে চলে আসে। জল খেল, পাখা চালালো, সিগারেট ধরালো। অন্য কেউ

আসেনি। এখনও তেইশ বছর চাকরি আছে। মাইনে চার অঙ্ক হয়ে যাবে পাঁচ-সাত বছরে। নীলকান্ত ভগবানকে ডেকে প্রায়ই মনে মনে বলে—একটু দেখবেন স্যার—হুট করে যেন টেসে না যাই। যেখানকার যা আছে তেমন থাক। তেল-নুনের দর যেন আর না লাফায়। রোদের তাতটা একটু পড়ুক। বড়লোকরা কিছুটা দয়ালু হলেই গরীবদের কষ্ট কমে যায়। আর স্যার আমি যেন বেঁচে থাকি। আসলে নীলকান্ত এই সেকটিপিন গাঁথা নিশ্চিন্ত জীবনটুকু ষোল আনাই চেটে চুষে খেতে চায়।

এহেন নীলকান্ত একদা আদর্শবাদী, প্রেমিক ও পরিশ্রমী ছিল। তখন সে বেকার ছিল। শুধু দোষের মধ্যে মেয়েছেলে দেখলে একটু আধটু ইংরাজি বলত—গলার আওয়াজ পাল্টে যেত রেঁস্তোরার বেয়ারাদের ধাঁচে 'বাও' করে বিদায় নিত। যেন এইমাত্র বকশিশ পেয়ে কৃতার্থ হল। আর তিনটি ইঞ্চি লম্বা হলেই নীলকান্তকে হিরো বলে চালানো যেত।

মানুষ নিয়ে কতলোক কত কথা বলে গেল। হোয়াট ইজ ম্যান? শুধু লোভ, শুধু দোষ, শুধু গুণ—নিশ্চয় নয়।

চাকরিটায় শ্যাওলা পড়ে গেছে। নীলকান্তর ভেতরেও এক পরত আরামের ওপর নিরাপদে থাকার বাসনা মসৃণ করে আগাগোড়া মাখানো। মিছিল দেখলে তার পরিষ্কার মনে আসে—কি করে সময় নষ্ট করছে। কাগজে যুক্ত ইসতেহার, মন্ত্রীদের বিধানসভার বক্তৃতা, কাটজুরি নদীতে বন্যা পড়ে সব তার কাছে সমান লাগে।

এই জাতীয় নীলকান্ত টেলিফোন বাজছে দেখে উঠে দাঁড়াল। এই অফিসে তার আরও একটা সুবিধে আছে। বিবেকের কোন রকম দংশন ছাড়াই বিনে পয়সায় প্রায় যথেচ্ছ টেলিফোন করতে পারে। সওদাগরি অফিস। ইন্দোনেশিয়ায় চা যায়—উগাণ্ডায় চটের থলে। এখানে নিয়ম মাফিক মাইনে বাড়ে। মালিক ওপরে ওঠার সময় শুধু একসঙ্গে লিফটে যেতে নেই। আর, লিফটে নীচে নামার সময়

সিকিউরিটি অফিসার থাকলে সে অবশ্যই নীলকান্তর গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবে। ক্ষমতা বোঝাতে চায়। পুলিশের রিটায়ার করা-লোক।

'হ্যালো।'

'নীলকান্ত বোস্—'

'হ্যাঁ। বোস্ বলছি।'

'নীলকান্ত বোস্?'

'ইয়েস—'

বহুকাল অনাত্মীয়া কোন দিদি, কুমারী, ছাত্রী কিংবা মিশতে চায় এমন কোন মেয়ের সঙ্গে ইদানীং তার আলাপ পরিচয় নেই। নীলকান্তর শালী হেল্‌থ ভিজিটর। সে এখন ঘাঁটালে। তবে কে হতে পারে।

'বলতো আমি কে?'

মহা মুশকিল। নাম না জেনে ফোন নামিয়ে রাখা যাচ্ছে না। আরও খানিকক্ষণ কথা বললে অফিসের টেলিফোন অপারেটর সব কথা শুনে নেবে।

'চিনতে পারলে না?' তারপর রেডিওর বিজ্ঞাপনে হেসে ওঠা মেয়ের ধারায় পাঁচ টুকরোয় ভেঙে গেল একখানা হাসি।

সঙ্গে সঙ্গে নীলকান্ত একলাফে সতের বছর পেছনে চলে গেল। বুকের ভেতরে রক্ত দলা বেঁধে থেমে গেল।

'চিনেছি। তুমি সরমা।'

'ভুল হয়নি।'

'গলা শুনেই চিনেছি। কোত্থেকে ফোন করছো?'

'তোমার অফিস থেকে পঞ্চাশ গজের ভেতরে। সেন্ট্রাল অ্যাভিনু পেরোলেই আমাদের অফিস।'

'পালিয়ে যাবে নাতো?'

'পাগল! এখান থেকে পালাবো কি করে! অন্তত সাড়ে পাঁচটা অব্দি তো আছি। আমার গলা শুনেই চিনে ফেললে!'

'জীবনের ওপারে গেলেও চিনে ফেলব।'

'তখন তো আমি নাকি সুরে কথা বলব। পেত্নীদের ভয়েস—'

'বলনা—কত নম্বর চিত্তরঞ্জন? আমি এখুনি তোমায় দেখতে চাই।'

'অফিস থেকে বেরোতে দেবে তোমাকে?'

'রিজাইন দিয়ে চলে যাব।'

'দেখো, রাস্তায় এখন অনেক গাড়িঘোড়া। আমি পালিয়েও যাচ্ছি না—ফুরিয়েও যাচ্ছি না। সাবধানে পার হবে—'

'কোন্ বাড়িটা তোমাদের অফিস বললে না?'

'এল-আই-সি-র পাশে—চারতলা, ডানদিকে। একটা নড়বড়ে লিফট্ আছে। উঠলেই মনে হবে প্যাকিতে আছো।'

ইস আজ যদি নতুন পাঞ্জাবিটা পরে আসতো। গায়ের পাঞ্জাবিটার হাতায় কপালের ঘাম মুছে মুছে দাগ পড়ে গেছে। আজ লিফটে সিকিউরিটি অফিসার ছিল না। কতবছর পরে সরমা—সরমা মিত্তিরের সঙ্গে দেখা হবে। অবশ্য দেখা করার কোন মানে হয় না।

সতের আঠারো বছর আগে সরমা ওদের বর্ধমানের ভাড়া বাড়িতে একবার মশারি টানিয়ে দিয়েছিল। তখন অনন্ত মিত্তির বেঁচে। পুলিশের এস পি। অনন্ত মিত্তিরের ছেলে বিশু নীলকান্তর ছেলেবেলার ক্লাস ফ্রেণ্ড।

প্রাইভেট, ট্যাক্সি, বাস, টেম্পোর স্রোত কাটিয়ে নীলকান্ত ওপারে গিয়ে উঠলো। সরমা সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্টের এক অফিসে আছে নীলকান্ত জানতো। কিন্তু এত কাছে! ভাবতেও পারেনি।

তেতলায় লিফটের গোড়ায় সরমা রিসিভ করল। প্রকাণ্ড হলঘর। মাঝে মাঝে মোজাইক পিলার ছাদে গিয়ে ঠেকছে। এদিক ওদিক খড়গোঁজা বাঘ, সিংহ মৃত্যুর পর পোজ দিয়ে দাঁড়ানো। কোণে সুন্দর নীলচে গ্লাসটপ টেবিলের গায়ে একখানি ত্রিপদী চেয়ার। পাশে নাইলনের সুতোয় গাঁথা একটি হাতব্যাগ। বোঝাই যাচ্ছে, সরমা ওখান থেকে এইমাত্র উঠে এসেছে।

'কি ব্যাপার ?'

সরমা চারিদিক তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'ওসব—ভারতের বন্যপ্রাণী। আমাদের দেশের পশুপ্রাণী।' ভিজিটার্স এলাকায় নীল কাঁচের স্লাইডে একটা গণ্ডার জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

'মরে গেলে আমায় এখানে খড়গুঁজে দাঁড় করিয়ে রেখো ওই কোণটায়—'

সরমা কোন আনাড়ির ভুল ধরতে পেরে ফুলে ফুলে হাসলো খানিক। নাইকোচড়ে একটা রুপো রঙের পাড় এসে নেমেছে বুক থেকে। 'তথি সুগভীর নাভি'। হাসতে হাসতেই বলল, 'এখানে আমরা খড় গুঁজে রাখি না। ট্যাক্সিডার্মিস্টরা স্পেশ্যাল প্রোসেসে বাঘ, সিংহ, গণ্ডার প্রিজার্ভ করে রাখে। আজকাল আমরা ময়ূর সংরক্ষণ করছি।'

'সংরক্ষণ ?'

'হুঁ। বিজনকে মনে আছে তোমার—আমার পরের ভাই। ওতো এখন মাদ্রাজে ট্যাক্সিডার্মিস্ট। আমিই ঢুকিয়েছি। পাঁচশোর ওপর মাইনে পায়।'

'বি এস সি পাস করেছিল ?'

'স্কুল ফাইন্যালের পর আর পড়েইনি।'

'ঢোকালে কি করে ?'

'কম কষ্ট করতে হয়েছে আমায় ! চল বসবে চল।'

নীলকান্তর হাত ধরে টেনে নিয়ে সেই বিরাট টেবিলটার সামনে বসালো। 'আমি এখানেই বসি। রিসেপসনিস্ট। ফোন গাইডে ডিরেক্টর জেনারেলের নামের পরেই নাম পাবে। মিস সরমা মিত্র।'

'নেকনজরে আছো।' বলতে বলতে নীলকান্ত আরেকবার সরমাকে দেখে নিল। ফিনলে কিংবা মফতলালের উইনডো ডিসপ্লেতে এমন তন্বীসন্নিভ মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সিঁথি থেকে একধারের সবটা চুলের ঢাল সেধারের কান ঢেকে আঁটো খোঁপার ঘোরপ্যাঁচে মিশে

গেছে। চোখের ওপরের নিছিতে মোটা দাগে কাজল। একটি নরম নাক—সামান্য ভোঁতা, তার নীচে জলজ ওষ্ঠে গোলাপি রঙের স্টিক বুলোনো।

নীলকান্তর মুহূর্তের বিভ্রম এক ঝটকায় কাটিয়ে দিয়ে সরমা বলল, 'খুব ইয়ার্কি হচ্ছে!'

'তুমি তো জানো—আমার কোন পারসোনালিটি নেই। দশ বছর হল বিয়ে করেছি। এখন একেবারে নাম্বার ওয়ান স্যালাক্যাপা।'

'কিরকম?'

'এই যে তুমি আমার সামনে বসে আছ—বিশ্বাসই হচ্ছে না। আরও অবিশ্বাস হচ্ছে তুমি নিজে ডেকে এনেছ বলে—'

'ওমা! তা ডাকবো না কেন? তোমাদের ক্যান্টিন থেকে আমরা চা আনাই। তুমি অফিসে আছো জানি—তাই ডাকলাম। অন্যায় হয়েছে—'

'কোন দোষ হয়নি। আমি যেটুকু পাই তাই ভাল।'

'খবর্দার! ওভাবে কথা বলবে না।'

'তুমিই বল শেষবার কবে আমায় ডেকেছিলে?'

হেসে ফেলল সরমা, 'এখানটায় বোস। ফ্যানের হাওয়া পাবে। কবে ডেকেছিলাম মনে করে রেখেছ নাকি! আমাদের বিডন স্ট্রীটের অফিসে এসেছিলে না?'

'ন' বছর আগে। তুমি তখন নতুন ঢুকেছ চাকরিতে। একপাল মেয়ে কলিগ নিয়ে টিফিনে গ্লাসে চা খাচ্ছিলে। তোমার টেলিফোন পেয়ে ছুটতে ছুটতে গেলাম। ঘরে ঢুকতেই মেয়ের পাল ঠোঁট টিপে হাসতে লাগল—'

'এই মিথ্যুক!'

'তুমি তখন প্রায় আমার ইন্টারভিউ নিতে শুরু করলে। সেদিন তুমি বললে অতগুলো মেয়ের সামনে এক পায়ে ঠায় দাঁড়িয়ে

থাকতাম। তুমি চাইলে একদিককার গোঁফ ছেঁটে ফেলে দিতাম চোখ বুজে—'

'এখন তো আর গোঁফ রাখো না দেখছি। খুব রেসপেকটেবেল চেহারা হয়ে গেছে। ন'বছর আগে তোমার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল।'

'তুমি জানো—তারও বছরখানেক আগে আমি বিয়ে করি। সেদিনও তোমার ঘোরে ছিলাম।'

'তাহলে এতদিনের অদর্শনে আমার ঘোর কাটিয়ে উঠেছ বল।'

নীলকান্ত কি জবাব দিতে যাচ্ছিল। থেমে থাকতে হল। দু'জন ভুটানী তিন কাঠের বাক্স বোঝাই দিয়ে পাহাড়ি ময়ালের পুরো একটা ফ্যামিলি নিয়ে এসেছে। সরমা তাদের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অফিসের ভেতরের ঘর থেকে চারজন অফিসার বেরিয়ে এলেন। মিনিট পনেরোর জন্যে নীলকান্ত পাকা ভিজিটর হয়ে গেল। সরমা তাকে চেনেও না। ভুটানীদের রিসিভ করা হয়ে গেলেই যেন সরমা তাকে অ্যাটেণ্ড করবে।

ময়ালপর্ব শেষ হলে একটা রঙীন পেনসিল কাঁচে ঠেকিয়ে সরমা খুব তৃপ্তি করে বলল, 'আমরা এই বিশাল ভারতবর্ষের ফ্লোরা অ্যাণ্ড ফণা—গাছপালা, পশু প্রাণী নিয়েই মাথা ঘামাই। আমাদের ব্রাঞ্চ পশু পাখির। বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণ। কত দুর্লভ প্রাণী চিরকালের মত হারিয়ে যাচ্ছে—'

'যেতে দাও।'

বেশ আবেগ দিয়ে পুরোগলায় বলে যাচ্ছিল সরমা। বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়াল, 'কেন?'

'ফিফটি ওয়ান থেকে ফিফটি সিক্স—এই বছরগুলোও কম দুর্লভ ছিল না। কোন দাম দিইনি আমরা—'

'আমরা কেন? বল আমি—সেদিনের তাজা বয়সের সরমা মিত্তির কোন দাম দেয়নি—কিছুই প্রিজার্ভ করেনি। কোন বয়সের

ঢাকনা তুললেও সেই বছরগুলোর সঙ্গে আর ফিরেও দেখা হবে না। কিন্তু তুমিও তো জোর করে আমাকে বলনি।'

নিওন আলোয় হলঘরের ভেতরকার মনোহর সাজে সাজানো প্রিফ্যাবের চিকন সচ্ছিদ্র বোর্ড খানিকক্ষণের জন্যে ধোঁয়াটে হয়ে এল।

'সেদিন কম জোর করিনি সরমা। আমারও বয়স কিছু বেশি ছিল না। সব বুঝতাম না। বাড়ি ভর্তি লোক। তুমি চান করে উঠে ঝোলানো আয়নায় সিঁথি কাটতে বসলে গলা জড়িয়ে চুমু খেতে গেছি। মুখ সরিয়ে নিয়েছো। আমলে আনোনি।'

'শুধু চুমু খেতে চাইতে কেন সেদিন। আর কিছু চাওনি কেন? জোর করনি কেন নীলকান্ত? আমি তো মনে মনে রাজিই ছিলাম। যদি শুধু একবার জোর করে, শক্ত করে ধরতে আমায় সেদিন! আমারও তো বিশেষ বয়স ছিল না তখন। কি বা বুঝতাম। তুমি জোর করে কেন ঠিক পথে নিয়ে এলে না নীলকান্ত—'

এতক্ষণ পরে বুঝলো সুধীরের জন্যে কেনা দেড় কেজির লোহার শেকল তার পাঞ্জাবির পকেটটা নিয়ে একদিকে ঝুলে পড়েছে।

সরমা তখনো থামেনি। দক্ষিণের দেওয়ালে আঁকা ভারতের ম্যাপে প্রদেশ বুঝে এক এক জায়গায় এক এক রকম পশুপাখি দাঁড়িয়ে নয়ত বসে আছে। কোণে এক উঁচুতে গান্ধীজী।

'তুমি তো অপেক্ষাও করলে না। আমাদের বাড়িতে কি যাচ্ছে তখন জানতে না। বাবা রিটায়ার করেছে তিরিশ হাজার টাকার দেনা মাথায় করে। বড়দা আলাদা হয়ে যেতে চায়। ছোড়দার কথা আর কি বলব তুমি তো তাকে জানো অনেকদিন—'

'বিশু এখন কোথায়?'

'সেই টিউটোরিয়াল ব্যবসা নিয়েই আছে। চুলদাড়ি কাটে না—নোংরা। শিবশিবানী এই রকম। চারটি মেয়ে হয়েছে পরপর।'

নীচে সেন্ট্রাল অ্যাভিনু দিয়ে গাড়ির পর গাড়ি বয়ে যাচ্ছে। এই

ভরতপুরে তিনজন বিদেশী রিক্শা থেকে নেমেই চাংয়োয়ায় ঢুকলো সঙ্গে চারটি দিশি মেয়ে। সবার হাতেই তালপাতার পাখা।

সরমা গুনগুন করে এক সুরই ফিরে ধরল. 'আমাদের সেই অবস্থায় তুমি একদিন আচমকা বউ নিয়ে দেখাতে এলে। আমাদের বড় ঘরের ঝোলানো আয়নায় উল্টোদিকে বসেছিলে। কোনাকুণি বসে আমি সব দেখছিলাম—'

'ইচ্ছে করে গিয়েছিলাম।'

'সে আমি সেদিনই বুঝেছি। বৌদি কেমন আছে? এখন তো বড়লোকের বউ।'

'ঠাট্টা করছো কেন।'

'বাঃ! তোমার সব খবর রাখি আমি। বাড়িঘর করেছো। ভাল মাইনে পাও। সেই বাউণ্ডুলে আর নেই তুমি। চেহারাতেই ফুটে উঠছে। মুটিয়েছো—'

'আগে দেখতে ফাইন ছিলাম না।'

'অনেক। ঝকঝক করতে।'

'তাহলে আমায় রিফিউজ করতে কেন? কি কম ছিল আমার?'

'ওঃ! খুব লেগেছে তো। এতদিনেও ভুলতে পার নি।' তারপর খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, 'বিলিভ মি—সেদিন রিসিভ, রিফিউজ কোনোটাই করিনি—তোমায় পেলে আজ আমাকে এমন সেজেগুজে কড়া আলোর নীচে আট ঘণ্টা বসতে হোত না নিশ্চয়!'

'ভাবের কথা এলে তুমি বুঝি ইংরেজি বল। তোমার বিডন স্ট্রীটের অফিসে সেবারে তোমার সঙ্গিনীদের সামনে আমাকে দাঁড় করিয়ে এমন তৃপ্তিতে হাসছিলে—যেন, ছাখো—আমার জন্যে একজন পুরুষ মানুষ কেমন নাচতে পারে—'

'নীলকান্ত।' সরমা উঠে দাঁড়িয়েছে। মুখ গম্ভীর। 'কেন সেই থেকে খুঁচিয়ে বানিয়ে এসব কথা বলছো? কারও বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। আমার বিরুদ্ধেও কারও কিছু বলার নেই।

আমি কোথায় পৌঁছেছি—কতদূর এসেছি একবার ছাখো নীলকান্ত। তুমি ছিলে একজন—হয়েছো কতজন। আমি?'

কথায় ঝোঁক ছিল। কোমরের নীচে লটকানো শাড়ির বাইরে শরীরের দুপাশে দু'খানি অকৃত্রিম হাড় মানানসই মাংস মেলে বেরিয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় সরমা বাস ধরতে যাওয়ার সময় ফুটপাতের অফিসভাঙা ভিড় আজও বিকেলে পেছন থেকে ফিরে ফিরে তাকাবে।

সরমা বসতে গেল। খচ্ করে আওয়াজ হল।

নীলকান্ত চমকে উঠে দাঁড়াল, 'কি কাণ্ড বলতো। ভুটানীরা এক কেস ময়াল ফেলে গেছে দেখছি।'

'ঘাবড়াবার কিছু নেই। এখুনি নিয়ে যাবে। তোমায় ডেকে বোধহয় ভুল করে'ছ। কেন যে দেখতে ইচ্ছে হল—'

'মোটেই করনি। আমার হাতের কাজ সেরে বিকেল বিকেল অফিস থেকে চলে আসছি। থেকো কিন্তু।'

'আজ যে ক্লিনিকে যাব।'

'যেয়ো। সঙ্গে থাকলে আপত্তি আছে?'

'কি পাগল ছাখো।' সরমা লিফট অব্দি এগিয়ে এল।

'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। এই যে তুমি দাঁড়িয়ে—মায়া—'

'নাঃ মতিভ্রম!' সরমা আলতো করে পিঠে চিমটি দিল। 'লিফট এসে গেছে—ওঠো!'

'তাহলে যা ঘটলো সব সত্যি। সেবারের মত 'না' বলে ফিরিয়ে দেবে না তো।'

'না গো!'

'একটু জোরে চিমটি দাও তো। বিশ্বাস হচ্ছে না, লিফট এসে দাঁড়াল।

'উঃ।' বলে একলাফে নীলকান্ত নড়বড়ে পালকিতে ঢুকে গেল। দশ বছরের পুরনো হাওয়ার ভেতরে খানিকক্ষণ থেকে এইমাত্র বেরিয়েছে নীলকান্ত। শেষের চিমটি এত জোরে দিয়েছে সরমা।

॥ ২ ॥

অফিস ফেরৎ আজ অনেক কাজ ছিল নীলকান্তর। গিন্নি বুদ্ধি করে তাকে না জানিয়ে দু'হাজার পোনা ফেলেছে পুকুরে। আগে চারা মাছ ফেলা ছিল সাঁইত্রিশ কেজি। এখন মাছে জলে একাকার হয়ে যাওয়ার যোগাড়। অথচ পুকুরে খাবার নেই। কাতলাদের কানকোয় সাদা মত পোকা হচ্ছে। হাফ কেজি পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট নিয়ে পুকুরে ছড়ানো দরকার। তা কিনতে ক্যানিং স্ট্রীট যেতে হবে। গরুর খোল মিল কিনবে শেয়ালদার মোড় থেকে। কুকুরের বেজারমিন ক্যাপসুলও ফুরিয়েছে। অবশ্য সুধীরের চেন কেনা হয়ে গেছে। বড় ছেলে 'কিশলয়' হারিয়েছে। তাও কিনতে হবে কলেজ স্ট্রীটে দেড়া দামে। এর পরও আছে খেয়ার জন্যে এক ফাইল ভিনকোলা। কুমড়ো গাছে পোকা লাগছে—সেজন্যে গ্রিনলা এক শিশি। আজ তিন বছর একজোড়া হনুমান পুষছে সুরেন আর বিজয়ের জন্যে বৈঠকখানায় এক কলাওয়ালা ঠিক করা আছে। তার কাছে থেকে ফি হপ্তায় এক কাঁদি করে সস্তায় কলা নিয়ে যায়। মাঠের মধ্যে অনেকটা জায়গা নিয়ে বাড়ি। সিগারেট আনতে হলে নীলকান্ত সুরেন নয়ত বিজয়ের হাতে চিঠি দিয়ে পোলের মাথার দোকানে পাঠায়। ঠিক নিয়ে আসে। এই সব নিয়েই তার সংসার।

এর ভেতর থেকে এইমাত্র নীলকান্ত দশ বছর আগের ফেলে আসা পৃথিবীতে খানিকক্ষণ ঘুরে এসেছে। পুরোপুরি উল্টো দুই জগতের মাঝখানে বসে নীলকান্ত বসু এখন চায়ের চালানের ভারতীয় টাকা ইন্দোনেশিয়ার 'রুপেয়ায়' কত তাই অঙ্ক কষে দেখছে। মাথার ওপরে ফ্যান ঘুরছে। বড় বড় অ্যাকাউন্ট সিট যাতে উড়ে না যায় —সে জন্যে পেপার ওয়েটের অভাবে সুধীরের লোহার চেন দিয়েই

চাপা দিয়েছে। হঠাৎ মাথা তুলে দেখল ঘড়িতে তিনটে বেজে দশ। জানালার বাইরে রোদ ঝলসাচ্ছে।

এমন বেলা তিনটে সাড়ে তিনটেয় সরমা ওদের বাড়িতে দশ বারো বছর আগে এক কাপ ট্যালটেলে চা ঠক করে নামিয়ে দিত। ততক্ষণে নীলকান্ত ওদের চিলেকোঠার ঘরে ঝাড়া চার ঘণ্টা করোগেটের নীচে সেদ্ধ হয়েছে। বিশুর অপেক্ষায়। ক্লাস থ্রি থেকে ফ্রেণ্ড।

তখন অনন্ত মিস্ত্রির দারুগা হলেও ভয়ঙ্কর পড়ুয়া মানুষ। মফঃস্বলে পাশাপাশি বাড়িতে থাকত ওরা। বিশু ক্লাসে প্রথম তিনজনের মধ্যে প্লেস রাখতো। পাড়ায়, ধানক্ষেতে, নারকোল বাগানে নীলকান্তকে অসভ্য কথা শেখাতো—যা বড়দের সামনে বললেই মার খেতে হয়। এই ভাবে ক্লাস সেভেন অব্দি কেটে গেল। মাঝে মধ্যে বিশুর সুতোয় মাঞ্জা দিতে নীলকান্ত কাচ গুঁড়ো করেছে, লাটিমের খাল মেঝেয় ঘষে ঘষে সরু করেছে। সরমার বাবা তখন বেশি রাত অব্দি হেরিকেন জ্বালিয়ে মোটা মোটা বই পড়তেন। হঠাৎ তাঁর প্রোমোশন হয়ে গেল। আই বি ইন্সপেক্টর। বড় বাড়িতে উঠে গেলেন। সে বাড়িতে সবুজ দূর্বায় মোড়া লনে পা ডুবিয়ে একটা ইউক্যালিপ্টাস গাছ সব সময় দোলে। স্কুল ফেরত একদিন বিকেলে বিশুর সঙ্গে গিয়ে দেখে ওদের বাড়ির পেছনে পুকুরপাড়ে স্থলপদ্মের গাছে দুটো বড় বড় কুঁড় পাপড়ি মুদে সূর্যের দিকে মুখ করে ঝুলছে। আর তার পাশেই লোহার ফ্রেমে টাঙানো দোলনায় সরমা দুলছে। মাথার চুল কপালে এসে পড়ছে—সরমা ওপরের ঝোঁক থেকে নীচে নামার মুখে মাথা ঝাঁকিয়ে চুল ঠিক করে নিচ্ছে। ফ্রকটা কি রঙের এখন আর মনে নেই। দোলনার এই ছবি, নতুন বাড়ির খোলামেলা ভাব ঘরে ঘরে নতুন পালিশের ফার্নিচার—সব মিলিয়ে সরমা সেদিন নীলকান্তর মনের ভেতরে গেঁথে গিয়েছিল। দোলনা উঁচু থেকে সরমাকে নিয়ে নামছে—বাতাসে ন' বয়সের আগে বুকের কাছে পাতলা একটা ঢেউ -সাদা উরু ঘিরে ফুলে ওঠা ফ্রকের ঘের—ভোলা যায় না।

প্রোমোশোন পেয়ে অনন্ত মিত্তিরের পড়াশুনো মাথায় উঠলো। দিন নেই রাত নেই সাইকেলে চড়ে গম্ভীর মুখে শহরের এ-রাস্তা সে-রাস্তা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর কাঁড়ি কাঁড়ি লোক অ্যারেস্ট হচ্ছে। রোজ রাস্তার মোড়ে—বন্দেমাতরম্। গান্ধিজী কি জয়। রোজ সকালের কাগজে হিটলার এগোচ্ছে।

অনন্ত মিত্তির আরেক ধাপ প্রোমোশন পেয়ে সিউড়ি বদলি হয়ে গেল। যাবার দিনও নীলকান্ত ভেবেছিল, সরমার পাশ দিয়ে হেঁটে গিয়ে বলে আসবে—'আই লাভ ইউ'। তখন শরৎচন্দ্রের 'কাশীনাথ' রিলিজ হয়েছে। অসিতবরণের লজ্জা কাটেনি। সুনন্দা বন্দী পাখির খাঁচায় দোলা দিয়ে গাইল—'ও বোনের পাখি-ই-ই—'

সিউড়ি গিয়ে বিশু প্রথমেই যা করল তাতে সবার চক্ষু চড়কগাছ। নীলকান্তর বাবার নামে পোস্টকার্ডে একখানা চিঠি লিখল। এখন নীলকান্ত বোঝে, নেহাত নির্মল আনন্দ করেই চিঠিখানা বিশু লিখেছিল। শহরসুদ্ধ লোকের মুখে চিঠির কথা ফিরেছিল। আজও নীলকান্তর তা মুখস্থ—

প্রিয় বিপন্নপালক,

তোমার ছেলে নীলু আমার ক্লাসফ্রেণ্ড। তাকে তুমি মাঝে মাঝেই অনর্থক পেটাও। হুঁশিয়ার। আই ওয়ার্ন ইউ বাঞ্চোৎ। আর মেরেছো তো তোমার সর্বনাশ। ভোরে উঠে রোজ দাড়ি কামাবে। পান খাওয়া ছাড়ো। সপ্তাহে রবিবার দিন অন্তত দাঁত মেজো। ইতি—

প্রণত—বিশু

চিঠির উল্টোপিঠে নীলকান্তকেও কয়েক লাইন লিখেছিল বিশু।

ভাই নীলু,

তোর বাবা শালাকে হুঁসিয়ার করে দিয়ে কয়েক লাইন লিখে দিলাম। এখানে আমাদের একটা ভাল পার্টি হয়েছে। কেউ বিশেষ ঘাঁটাতে সাহস পায় না। পড়াশুনো করছিস কেমন? তোর

প্রাণের সরি মাইরি একটুও টসকায়নি। কোন ফিলিংস্ নেই মাইরি। ইতি—

তোর বিশু

চিঠি হাতে নিয়ে বিপন্নপালক বসু, সেদিন প্রথমেই নীলকান্তকে এক রাউণ্ড পিটিয়ে নিয়েছিল, 'বল্ হারামজাদা কে তোর সরি? আমি এখুনি অনন্তবাবুকে চিঠি লিখব।' কত আর গুল দেব সেই বয়সে। গরুর নাম সরি? কোন বন্ধুর নাম সরি? কিছুতেই মেলাতে পারে না।

নীলকান্ত মারধোর খেয়েও সরির কথা বলেনি। তখন কণ্ঠমণি ঠেলে ওঠার বয়স। গলা ভেঙে কদাকার। হাফপ্যান্টের নীচে আদুড় হাঁটু দু'খানা ঢাকার জন্যে সবসময় হাত ঝুলিয়ে রাখতো। মার খেয়ে মরে গেলেও সরি কে সে তা বলবে না। কেন যে বিশুকে সরমার কথা বলতে গিয়েছিল। তারই তো বোন।

পিটিয়ে টায়ার্ড হয়ে বিপন্নপালক একেণ্ডি কোম্পানীর চুণের গোলায় চলে গিয়েছিল। সেখানে থাজাঞ্চি ছিল বিপন্নপালক। সব সময় চুণ উড়ছে গোলায়। তাই জামা পালটাতো না দাড়ি কামাতো না দাঁত মাজতো না বিপন্নপালক। মা এই নিয়ে ঝগড়া করলে বলত, 'কি হবে পরিষ্কার হয়ে? আবার তো ময়লা হয়ে যাব।'

সরমাদের বাড়ি অত তকতকে। কাঠের আলমারিতে সারি সারি বই। পুকুরপাড়ে স্থলপদ্ম—দোলনা। নীলকান্তদের বাড়ি রান্নাঘরের চালে বিচি রাখবার জন্যে বুড়ো লাউ হলদে হয়ে থাকতো। অনেকদিন ধরে রাখার জন্যে মা বারান্দায় বসে সারি সারি সাজানো পাকা কুমড়োর বোঁটায় বাবার বিনি পয়সার চুণ মাখাতো।

সিউড়ি যাবার আগে নতুন গান শিখে সরমা একদিন বিকেলে ওই বারান্দাতে মাকে শুনিয়েছিল—'কুঞ্জ সাজায়ে দে লো।' শৈলেন রায়ের লেখা, কানাকেষ্টর গলা। বাড়ি বদলাবার সময় রেকর্ডখানা ভেঙে যায়। একটা টুকরো নীলকান্ত কুড়িয়ে রেখে দিয়েছিল অনেক-

দিন। সেদিন সরমার গানের সঙ্গে উঠোনের পেয়ারা, পেঁপে, নানান গাছগাছালির পাতা কাঁপছিল।

কে যে লিখেছে ঠিক মনে নেই নীলকান্তর। তবে সিওর কোন মনীষী। সঞ্জীবচন্দ্র? বঙ্কিম? রবীন্দ্রনাথ নয়ত। কথাটা কিন্তু ভীষণ সত্যি। 'বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ আছে।'

ওদিকটা পাকিস্তান হয়ে গেল। এদিকে এসে নীলকান্ত বি এস সি ভর্তি হল। তিন দিন অন্তর দাড়ি কামায়। রাত ন'টায় রেডিওতে অনুরোধের আসরে হেমন্তর গানের সঙ্গে গোপনে গলা মেলায় আর গানের কথার দুঃখের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিতে চায়।

ফিজিক্স প্র্যাক্টিক্যালে 'রেজোনান্স অব 'সাউণ্ড' মাপামাপি চলছে। শব্দ প্রতিধ্বনি কতদূর যায়—তাই নিয়ে পড়াশুনো, অঙ্ক, ক ত ?? তখনো বুশশার্ট গায়ে একটি ছেলে কাছে এসে বলল, 'আপনার ডাকনাম নীলু?'

নীলকান্ত মাথা নাড়তেই ছেলেটি বলল, 'বাইরে চলুন। আপনার সঙ্গে জরুরী কথা আছে।'

একটু ফাঁকায় এসে দু'জনে দাঁড়াল। ছেলেটি বলল, 'আমার দিকে পেছন ফিরে একটু দাঁড়ান তো।'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। কেন বলুন তো?'

'দাঁড়ান না। এখুনি বলছি।'

নীলকান্ত পেছন ফিরে দাঁড়াতেই ছেলেটি তার পাছায় ধাঁই করে এক লাথি কষালো। 'এখনো চেনোনি আমায়? আমি তোদের বিশু রে।'

একটি লাথিই সাফিসিয়েন্ট। দীর্ঘ অদর্শনের বিস্মৃতি কাটিয়ে এক সেকেণ্ডেই বিশু জলজ্যান্ত হয়ে উঠলো। সেই মুখ, ঘন ঘন নস্যি নেয়, সিগারেটও ফোঁকে। সেদিন আর কোন পড়াশুনোই হল না। ওর সঙ্গে নীলকান্ত মেডিক্যাল কলেজগুলোতে ঘুরলো। ফার্স্ট ডিভিশনে

আই এস সি পাস করে ডাক্তারি পড়ার জন্যে বিশু অ্যাপ্লাই করেছে। এখনও রেজাল্ট জানা যায় নি।

অনন্ত মিত্তির তখন বর্ধমানের এস পি। বিশু কলেজ হোস্টেলে থাকে। একদিন হোস্টেলের ঘরে নিয়ে গিয়ে ওর নিজের পরনো-গ্রাফির লাইব্রেরি দেখালো। ষোল সতের পাতার এক একখানা বই। পাঁচ সাত টাকা করে দাম। সবসময় বিশুর তোষকের নীচেই থাকে। অন্য রুমমেটরাও পড়তে আসে।

ছোটবেলায় বিশু নীলকান্তকে অনুচ্চারণীয় কিছু কথা শিখিয়েছিল। পরে সে সব কথা বাথরুমের দেওয়ালে, রেলের কামরায় লেখা দেখেছে। এবার এতদিন পরে সেই বিশুই তার সামনে নতুন জ্ঞানভাণ্ডারের দরজা খুলে ধরল।

সেই ঘরে কলেজের পোষা তিনজন ফার্স্ট ডিভিশনের ফুটবল প্লেয়ারও ছিল। তারা ভাড়ায় খেলে ঘোরার পর এই ঘরে বসে বিশুর লাইব্রেরির বই পড়ত। বিশু তাদের সিগারেটের ভেতর গাঁজা পুরে খাওয়া শিখিয়ে ফেলল অল্পদিনের মধ্যেই।

এতসব করেও বিশু মেডিক্যাল কলেজে সিট পেয়ে গেল। নীলকান্ত জানতো বিশু পাবে। আরও জানতো প্রিলিমিনারি টেস্টে ফিফটি পারসেন্ট নম্বর না রাখতে পারলে তাকে অনার্স ছেড়ে দিয়ে পাসে পড়তে হবে। কেননা, সে সেকেণ্ড ডিভিশনের ছেলে? তার আর কোন গতি নেই। বিশু মেডিক্যাল কলেজে চলে গেল। এই ক'দিনের মেলামেশাতে নীলকান্ত সব গুলিয়ে ফেলল। তাকে অনার্স ছাড়তে হল

কিন্তু পেল অন্য জিনিস। সেই বয়সের পাওয়া—সে যে কি! যে পেয়েছে সেই জানে শুধু।

মেডিক্যাল হোস্টেলে বিশু একদিন নিজেই বলল, 'তোর সরিকে দেখবিনে? কেমন হল এতদিনে!'

বলি বলি করেও বলা হয়নি নীলকান্তর। অবশ্য বিয়ে যে হয়নি তা সিওর। হলে এতদিনে বিশু বলতই।

'ওরকম ল্যাঙ্গোয়েজে বলিসনে।'

'কেন? তুই তো লাভার!'

'হাজার হোক তোর বোন তো—'

বিছানায় বসেছিল নীলকান্ত। এক ঝটকায় তাকে তুলে দিয়ে বিশু তোষকের তলা থেকে ছোট সাইজের কিছু বই বের করে অঙ্ক কষতে বসে গেল। একবার মুখ তুলে বলল, 'শনিবার গভরনরস কাপ। সন্ধ্যে সাতটা দশের ট্রেনে সেখানে যাব। তুইও যাবি—'

নীলকান্ত কিছু বলতে পারল না। সে তো যাবার জন্যে তৈরিই ছিল। বেলা দশটা। অ্যানাটমির ক্লাস হয় বড় বাড়িটার একতলার হলঘরে। সেখান থেকে ছেলেরা বেরোচ্ছে। নীলকান্ত বলল, 'তুই ক্লাসে গেলি না?'

'গুলি মারো! আজ রেস।' বিশু চান করতে চলে গেল। নীলকান্ত তোষক তুলে দেখল, নীচে ছোট বইয়ের জাজিম হয়ে আছে। পরনোগ্রাফির লাইব্রেরিটা বিশু সেই তিনজন প্লেয়ারকে দান করে এসেছে।

ট্রেন থেকে নেমে ওদের বর্ধমান টাউনের বাড়ি পৌঁছতে রাত সাড়ে ন'টা বেজে গেল। বিজনের পরেও একটা ভাই হয়েছে বিশুর সে খিতে পড়ে। নাম বলল, কৃষ্ণ মিত্র। বিজনের সিক্স। মাসিমা অনেক কথা জানতে চাইল। কে কোথায় আছে। খেতে বসে নীলকান্ত আশা করেছিল, সরমা একবার আসবে। এল না। সামনেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা। দোতলার বসে ভারতের খনিজ পদার্থ মুখস্থ করছে সেই থেকে।

সরমা এল। মশারি টানাতে। ওঠবার সরু সিঁড়ির বাঁকে বালিশ, মশারি হাতে সরমা আটকে গেল। নীলকান্ত সরে গিয়ে রাস্তা করে দিল।

'কত বদলে গেছ তুমি। একটু ঢ্যাঙা দেখাচ্ছে।'

নীলকান্ত বলল, 'আমি বুঝবো কি করে!'

'আমি বদলাইনি?'

ছোট 'হুঁ' ঠুকে দিয়ে নীলকান্ত ওপরে উঠে এল। আগাগোড়া বদলে গেছে সরমা। তেলের বিজ্ঞাপনের মেয়েদের চেয়েও লম্বা চুল। বাড়িতে শান্ত অথচ জ্বলন্ত। ওপরের ঠোঁটের গায়ে পাতলা একটা কেশ-রেখা। দোলনার-সেই ঢেউ এখন কত পুরন্ত।

রেডিও শেষ হলে সরমা মশারি টানিয়ে দিয়ে গেল। বিশু উল্টোদিকের বিছানায় পা তুলে দিয়ে 'ওয়াইলড্ উডবাইন' ফুঁকছে। ঘন সবুজ রঙের প্যাকেট পড়ে আছে পাশে। সামনে সবুজ ছাপ মারা পেঙ্গুইনের ক্রাইম সিরিজের কোন আগাথা ক্রিস্টি খোলা ছিল বোধ হয়। বিশু একমনে পড়ছিল।

সরমা মশারি গুঁজে দিয়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিশু তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো, 'কিছু বললি না?'

'কাকে?'

'ন্যাকা! সরিকে আবার কাকে—এতদিন পরে দেখা হল।'

যা কথা হয়েছে, নীলকান্ত বলল।

'ও তো মামুলি। বেশ সুইট ইমপ্রেসিভ কিছু বলবি তো। তোকে নিয়ে আর পারা গেল না।'

'ঘরে তুই ছিলি যে।'

'আগে থেকে সিগন্যাল দিবি তো। কুমীরের মত চোখ বুজে মরে পড়ে থাকতাম।'

'শেষে লাফিয়ে ঘাড় মটকাতিস আমার!'

'তোর কিছু হবে না।' হেসে বলল, 'মাইরি এ-মাসের হোস্টেল ফি, পকেটমানি সব কিছু মাঠে দিয়ে আজ সর্বস্বান্ত হয়েছি। রেলের টিকিট তুই কেটেছিস। কাল সকালে কলকাতা ফেরার খরচও তই দিবি। একটা পয়সা নেই হাতে।'

'এ-ভাবে আর কতদিন চলবে তোর ?'

'সামনের মাসেই বাবা কলকাতা বদলি হচ্ছে। আলিপুরে পোস্টিং। তখন আর হোস্টেলের ঝামেলা থাকবে না।'

তারপর শুয়ে শুয়েই বিশু নীলকান্তকে ভালবাসার লোক বশ করার একটা প্রক্রিয়া শেখালো। খুব অবলীলায়। নীলকান্ত খুব অবাক হচ্ছিল। ছোটবেলার বন্ধু। কেমন আস্তে আস্তে বদলে গেছে। সিঁড়ি যে কেন যেতে গেল। মেডিক্যাল পড়ছে—অথচ পড়াশুনোর নামগন্ধ নেই। এম. বি. বি. এস তো আর শেষরাতে বাজিমাৎ করার কোর্স নয়।

বিশু তখন শেখাচ্ছিল, 'যাকে তোর মনে ধরবে—তার দুই ভ্রূর মাঝখানে তাকাবি। চোখের পলক ফেলাবি না। ও প্রথমে বুঝতে পারবে না। পরে ফিরে তাকাবে। তখন আর মুখ ফেরাতে পারবে না। তুই মনে মনে বলতে থাকবি—কচতটপ, খছথঠপ—এইভাবে ওই সিরিজে যা যা আছে বলে যাবি—'

নীলকান্ত হাসিতে ফেটে পড়ছিল।

'এখনও সবটা বলিনি—শোন্—'

'এনাফ্ !'

'উহু। শোন না ক-বর্গ-খ-বর্গ তো শেষ করে ফেললি। তারপর ওই অবস্থাতেই দুই ঠোঁট এক করে আলগোছে হাওয়ায় একটা চুমো খাবি—মনে করবি—হাওয়া একটা পার্সোনালিটি—মেয়েটির একটি সুদূর সত্তা—এক্সটেন্ডেড্ পার্সোনালিটি—'

'ওয়াণ্ডারফুল ! সবটাই তো ব্রেনওয়েভ্। এত জানিস—এত বুঝিস—অথচ যেভাবে রেস খেলছিস্, পয়সা ওড়াচ্ছিল তাতে নির্ঘাত এম বি পরীক্ষায় গুলোবি।'

মফঃস্বল শহরের মাঝরাত। ছাদে ছাদে রোডওর এরিয়াল কুয়াশায় চাপা পড়েছে। নীলকান্তকে এড়াবার জন্যে বিশু তখনকার

একখানা ফিলমি হিট গানের এক কলি গেয়ে দিল, 'ম্যায় তো লুটে গয়া রাম দুহাই-ই—'

তারপর বিশু ছোট বই স্টাডি করতে শুরু করল। নীলকান্ত ঘুমিয়েই একটা স্বপ্ন পেয়ে গেল।

এসপ্ল্যানেডে ট্রামের আড়তে ট্রাম নেই। ফাঁকা জায়গায় অনেক উঁচু দিয়ে একটা দোলনা টাঙানো। মেট্রোর দিকে স্থলপদ্মর বন। গাছে গাছে কাগজের পদ্ম। ভেতরে ট্যাক্সির লাইন। বেশির ভাগের মিটারে লেখা, 'গ্যারাজ' নয়ত, 'ডিফেকটিভ'। লাল কাপড়ে মোড়া মিটার সুদ্ধ একখানা ট্যাক্সি এসে থামল।

পাশের দরজা খুলে দুটি মেয়ে এসে নামল দু'জনই সরমা। কাঁচ কলাপাতা রঙের ফ্রক পরে একজন ছোটমত সরমা এসেছে। আরেকজন ডগডগে লালপেড়ে শাড়ি পরনে সরমা। দোলনায় ছোট সরমাকে বসিয়ে বড় সরমা দোল দিল। একদিকে কে সি দাশের রসগোল্লার শো-কেস—অন্যদিকে টুয়েলভ সি বাসের আড্ডা—এই দু'দিক ছুঁয়ে ছোট সরমা দুলতে লাগলো, বড় সরমার কি হাততালি। বাতাসে কাগজের পদ্ম খসে খসে পড়ছে। কয়েকটা ট্যাক্সির চাকার নিচে চলে গেল।

ঘুম ভাঙলো অনেক সকালে। বড় সরমা তখনও ভারতের খনিজ পদার্থ মুখস্থ করছে। চা খেয়েই দু'জনে ছুটলো। ধানকাটা মাঠের ভেতর দিয়ে একখানা মেলট্রেন বর্ধমান স্টেশনে ঢুকছে।

রেলের টিকিট, দু'দফা চা, একপ্যাকেট ওয়াইল্ড উডবাইন সেই কিনল নীলকান্ত।

এইভাবে আরও অনেক কিছু কিনেছে নীলকান্ত। লাভার নীলকান্ত সরির প্রেমিক নীলকান্ত। কিন্তু কোনদিনই সরিকে বলা হয়নি।

সরমাকে নীলকান্ত বলেছিল অনেক পরে।

অনন্ত মিত্তির আলিপুরে পোস্টিং নিয়ে বদলি হয়ে এল। ডায়মণ্ড হারবার রোডে শহরতলিতে বড় বাড়িতে উঠে এল ওরা। অরিজিনাল

একজন চালের কারবারী তার রক্ষিতার জন্যে বাড়িটা বানিয়েছিল। লোকটার গণ্ডগোল ছিল। সদর এস পি-কে তোয়াজে রাখতে নাম মাত্র ভাড়ায় বাড়িটা দিল।

নীলকান্ত ছোটবেলা থেকেই দেখেছে, অনন্ত মিত্তিরের বাড়ির বাজার করে পুলিশ। চিঠি ডাকে দেয় পুলিশ। তালা সারানোর চাবিওলা ডেকে আনে পুলিশ। এ-বাড়িতে পুলিশ আরও বেড়ে গেল। জিপগাড়িতে নিজের সিটের কাঁধে অনন্ত মিত্তির সবসময় একখানা তোয়ালে রাখত।

হোস্টেল ছেড়ে বিশু আশ্রয় নিল এ-বাড়ির চিলেকোঠায়। ওপরে করোগেট। গরমের দিনে নরক, রাতে স্বর্গ। সে ঘরের তাকে অনন্ত মিত্তিরের দরবার প্যারেডের বাতিল সোর্ড, পোকায় কাটা কানিসওয়ালা টুপি, নানা বয়সের বেল্ট, পট্টি, শ্যাওলাধরা বুট এসে জমা হল। বিশু নিয়ে এল রেসের বই, নম্বির ফাইল আর একটি কঙ্কাল। সিঙ্গল খাটে নীলকান্ত মাঝে মাঝে অ্যানাটমির ঢাউস বইখানা মাথায় দিয়ে শুয়ে থাকত। তখনও সরমা ফাইনালের জন্যে তৈরি হচ্ছে। মাসখানেক বাদেই বোধ হয় ম্যাট্রিক পরীক্ষা।

বিধান রায় প্রথম যেদিন বেহালায় স্টেট বাসচালান—সেদিন ভোরের ফার্স্ট বাসে ফার্স্ট প্যাসেঞ্জার নীলকান্ত। কি আনন্দ। বিশুদের বাড়ি যেতে তাকে আর তিন তিনটে বাস বদলাতে হবে না। মনে মনে বিধান রায়কে 'হ্যাটস অফ' করল।

অতি ভোরে সারা বাড়ি ঘুমোচ্ছে। সামনের মাঠে শিশিরে মাখানো দূর্বা মাথা তুলতে পারছে না।

নীলকান্তদের চেয়ে সামান্য বড় একজন শক্ত বাঁধুনির মেয়ে ফাঁকা বারান্দায় স্কিপিং করছে। আঁচল কোমরে টাইট করে পেঁচানো। তাকে দেখে লাফানো থেমে গেল।

'তুমি নীলু? দেখেই চিনেছি। আমি বিশুর ছোটমাসি। শিয়াখালা থেকে কাল এসেছি। বিশু নিয়ে এল।

নীলকান্ত কিছু বলতে পারল না।

'বিশুর মুখে তোমার কথা অনেক শুনেছি। সরির জন্যে তুমি আসো বুঝি এখানে। ফিক্ করে হেসে ফেলল ছোটমাসি। তারপর ওই নামেই তাকে ডেকেছে নীলকান্ত। সেদিন ভোরের আনন্দ ছোটমাসিই অনেকটা ফুটো করে দিয়েছিল। পরে, অনেক পরে নীলকান্ত বুঝতে পেরেছে—গ্রামের একটি ডাঁটো মেয়ের পক্ষে ও ভাবে কথা বলাই স্বাভাবিক ছিল। পরে একসঙ্গে কত তাস খেলেছে নীলকান্ত। বিশু বলত, 'ছোটমাসি কালীসাধিকা। তুকতাক জানে। গুণ করতে পারে।'

চোখে পোকা না পড়লে সবই নীলকান্তর নজরে পড়া উচিত ছিল। কিন্তু তখন তার মাথা, চোখ, কান—এমনকি গন্ধ পাওয়ার শক্তি—সবকিছু নিয়ে সে একটি পদধ্বনির জন্যেই মনে মনে চুপ করে থাকত।

সরমা সবই বুঝতো বলে, আসতো কম—কথা বলতো তার চেয়েও কম। তখনও মুখে মাখতো হিমানী স্নো—গায়ে হিমানী সাবান। একদিন নীলকান্ত বেহালার বাড়ির কলঘরের বারান্দায় একপিস সাবানের ফেলে দেওয়া রাঙতা কুড়িয়ে গন্ধ শুঁকেছিল।

তবে অত ভোরে ছোটমাসির স্কিপিংয়ের কারণ জেনেছিল অনেক পরে।

॥ ৩ ॥

'কলকাতার রাস্তায় আমার হাঁটতে ইচ্ছে করে না একদম।' সরমা স্টেটস্‌ম্যানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। নীলকান্ত সবচেয়ে অসুবিধায় পড়েছে সুধীরের গলার চেন নিয়ে। হাতে ঝুলিয়ে নেওয়া যায় না। পাঞ্জাবির পকেটে মুঠোহাত করে চেনটা নিয়েছে। এতটা ভার একসঙ্গে পড়লে ঘামে ভেজা আদ্দি ফস করে ফেঁসে যেত।

'একটা যদি ট্যাক্সি পাওয়া যেত।'

'অফিস ভেঙেছে। এখন ট্যাক্সি পাবে না। চল হাঁটতে হাঁটতে ময়দানে যাই।'

'এতটা হাঁটতে কষ্ট হবে না সরমা?'

'আমার কি ননীর শরীর।'

এসপ্ল্যানেড পোস্ট অফিসের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় নীলকান্ত সরমাকে খুঁটিয়ে দেখল। ওবেলা দেখেছিল নিওনের আলোতে—এবেলা দেখলো দিনের আলোয়। এই সরমা দোলনায় চড়ত। অনন্ত মিত্তিরের একমাত্র মেয়ে। ওয়ারকিং গার্লের অনায়াসে হাঁটাচলা—হাতব্যাগের একদিক চৌকো হয়ে ফুলে উঠেছে—সেখানে টিফিনের কৌটোর আভাস। হাড়ে মাসে মেলানো চলন্ত চমক। আশপাশের দু-একটা মেয়ে হিংসেয় কুটকুট করে উঠছে—ফিরে ফিরে দেখছে।

নেতাজীর স্ট্যাচু ছাড়িয়ে গিয়ে ওরা মরা ঘাসের ওপর বসল। যুদ্ধের পর থেকেই লোকে এভাবে মেয়ে নিয়ে মাঠে বসছে। 'আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না সরমা।'

'তুমি এত ইমপটান্স্ দিচ্ছ কেন? মনে করে নাও সরমা নই। তিরিশ পেরোনো একজন রিসেপসনিস্ট।'

'অফিসে তোমার অসুবিধে হয় না।'

'আগে খুব হত। অল্পবয়সী টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টরা টিউব লাইটের নীচে আমাকে দেখে চমকে যেত। কাজে অকাজে ঘুর ঘুর করত। ক'দিন আলাপের পরেই আমার বাইরে কোন কাজ আছে কিনা জানতে চাইতো। এখনও চায়। মানে, ওরা আমায় রোদে বেরোতে দিতে চায় না। জায়গায় বসে ওদের দিয়ে মায়ের অ্যাজমার ওষুধ আনিয়েছি—আমার থি বাই থি কাটপিস কিনিয়েছি—'

'আমিও মে মাসের দুপুরে তোমার নোটবই কিনতে বেরিয়েছি। সবচেয়ে কষ্ট হত তিন চার ঘণ্টা চিলেকোঠার নীচে বসে থাকতে।

বিশু কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্যে একসঙ্গে তৈরি হবে বলে ডেকেছে। আমাকে বসিয়ে ও রেসের মাঠে। বসে আছি, গরমে সেদ্ধ হচ্ছি। তুমি ঘর অন্ধকার করে একতলায় ঘুমোচ্ছ।'

'ওসব কথা আজ থাক—'

'চারটে সাড়ে চারটেয় এক কাপ চা ঠেকিয়ে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে গেলে। আমি দেখতাম—পাউডারের গন্ধ চারিয়ে দিয়ে তুমি পাড়ারই তিন চারটে হাবাগোবা মেয়ের সঙ্গে খুব তুচ্ছ কোন কারণে বেরিয়ে যাচ্ছ—হয়ত কারপেটের মোটা ছুঁচ আনতে যাচ্ছ মোড়ের দোকানে।'

'এত মনে থাকে তোমার।'

'আর কিছুদিন পরেই ভুলে যাব।'

পূর্ণকুম্ভ ঘাড়ে চা-ওলা ঘুরছে। নীলকান্ত থামল। বড় খুরিতে চা নিল দুজনে। চোদ্দ পনর বছরের ছেলেরা এলেবেলে খেলতে খেলতে এদিকেই বেশি বল মারছে। প্রথমে ব্যাক এসে সরমাকে দেখে গেল। তারপর সেন্টার হাফ। একে একে শেষে গোলিও এল। সরমা দাঁতে কেটে হাসল, এরা তপুর চেয়েও ছোট।'

'তপু?'

'বিজনের পরে তো তপু। এখন বড় হয়ে গেছে।' একটু থেমে বলল, 'মেয়ে হলে এসব গা সয়ে যায়। কেমন হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসছে—কিক করার ফাঁকে এক একজন দেখে নিচ্ছে। বড় মায়া হয়। ঘেন্না করে যখন বুড়োরা আর চোখ ফেরায় না।'

'তপু কি পড়ছে?'

'সেসব পাট শেষ। কলেজে সিট না পেয়ে বসেছিল। আজ চার বছর আই এন এস্ বিক্রাণ্ড-এ গানার। ইণ্ডিয়ার একমেব এয়ারক্র্যাফট কেরিয়ার। আরব সমুদ্রেই বেশি ভেসে বেড়ায়।'

'তাহলে তুমি আর চাকরি করছ কেন?'

সরমা তাকিয়ে আছে দেখে বলল, 'বিশু কিছু দেয় না বাড়িতে?'

'তাহলেই হয়েছে! এক পাড়াতেই বৌ নিয়ে আছে। সন্ধ্যেবেলা দু'দিন যেতে বলেছে। গেছি। একপাল মাতাল নিয়ে জুয়োর বোর্ড বসেছে। বুঝলাম, আমাকে দেখিয়ে পয়সা নেবে। বৌদিও তেমন। আর যাই না।'

নীলকান্ত বহুকাল পরে অন্য একটি মেয়ের হাত ধরল। রেখা ছুটির দিন রাতে ছেলেমেয়ে ঘুমোলে এখনও আলতা পরতে বসে। তখন নিজের বৌকে অন্য মেয়েলোক ভেবে বড় লোভ হয়। সেসব দিন আর তর সয়না। পাঁজাকোলে রেখাকে তুলতে বেশ বেগ লাগে।

সরমা হাত ছাড়ালো না। বরং নীলকান্তর হাতখানা শক্ত করে ধরল, 'বাবার শ্রাদ্ধের একমাসের ভেতর ছোড়দা বিয়ে করল। বড়দা বলেছিল, বছর ঘুরুক—তারপর করিব। বাড়িভাড়া রাইসমিল ওনার। দশমাসের ভাড়া বাকি এই অজুহাতে আমাদের তুলে দিল। বড়দা তখন টাকিতে। ছোড়দা একবারও এল না। বিজন, তপু—দুজনেই ছোট। আমি একটা স্কুলে ডেপুটেশনে আছি। হাতে আশিটা টাকা মোটে। সেই অবস্থাতেই ওই ছোট বাড়িটায় উঠে গেলাম।'

'আন্দাজ করেছিলাম কিছুটা।'

'তুমি তো তখন আমার সঙ্গে প্রেম করতে আসতে। আমার তখন প্রেমের টাইম ছিল না একদম—'

'এতটা ঘটেছে—কোনদিন জানতাম না। তুমি এড়িয়ে যেতে—বেশু আমার পুরনো বন্ধু—দুবেলা আমাকেই মিথ্যে কথা বলছে, কারণে অকারণে। ঘেন্নায় যাওয়া ছেড়ে দিলাম। তবে এসব তো বলনি কোনদিন?'

'ছোটবেলা থেকে কিভাবে মানুষ হয়েছি বল নীলুদা। আমার কি এসব করার কথা!'

সেকথা নীলকান্তর চেয়ে আর কে ভাল জানে। সরির ম্যাট্রিকের সিট পড়েছিল চেতলার এক স্কুলে। বাবার জিপগাড়ি পৌঁছে দিত—নিয়ে আসত। টিফিন নিয়ে যেত নতুন নতুন কনেস্টবল্। বর্ধমানে

থাকতে যার চোখের জল মোছাতে অনন্ত মিত্তির শক্তিগড়ে গাড়ি পাঠিয়ে ছানার ল্যাংচা আনাতো। সেই সরি। টিফিনে সরির সঙ্গে দেখা করার জন্যে নীলকান্ত কনেস্টবলের মৃত্যু কামনাও করেছে।

'তাই কোনদিন নীলুদা তোমাকে এসব কথা বলতে পারিনি আমার মত মেয়ের পক্ষে বলা যায় না। মোট দু'খানা শাড়ি এমন কেচে পরতাম—সব সময় পরিষ্কার থাকতাম।'

'তাতেই তো আমার মাথা আরও খারাপ হল! বিশুর শেখানো টেকনিকের কোন দরকার ছিল না। নীলকান্ত ঝুঁকে বসল, সরির টিকলো আলগোছে হাত রাখল, 'কত বছর তোমাকে চুমু খাইনি। ভুলেই গেছি।'

সরমা গম্ভীরমুখে বলল, 'খেয়ো। ভাল লাগবে কিনা জানি না।'

সন্ধ্যার আলো জ্বলতেই গঙ্গার বিখ্যাত হাওয়া দিল। গভরনর হাউসের নুড়ি বিছানো দীর্ঘপথ এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। জ্ঞানীগুণী বুড়ো হলে ওই বাড়িতে রাজ্যপাল হয়ে থাকতে পায়। নীলকান্তর তখনি মনে হল, প্রেমিক প্রেমিকার যৌবনে থাকার পক্ষে বাড়িটা আইডিয়াল।

তার সামনে এখন সরমা নয়—মূর্তিমতী বিষাদ বসে আছে। ওকে আর কথা বলতে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল না নীলকান্তর। কিন্তু রেকর্ড ফুরোয়নি তখনও।

'বিজন আজকাল একটা চিঠিও দেয় না। টাকা পাঠাতে বলে কোন লাভ নেই। শুধু শুধু মুখ নষ্ট। ছুটিতে এসে কাজে ফেরার সময় এই দিদিকেই ট্রেনভাড়া দিতে হয়।'

'তপু?'

'ওকে বলেও লাভ নেই। নীলুদা এ দুজনকে কাজে ঢোকাতে মেয়ে হয়ে আমি কম কষ্ট করেছি? ভাবতে পারবে না—'

'ভাবলেই ভাবা যায়। কি লাভ! বড়দা?'

'সে অবশ্য কিছু কিছু দেয়। তারও তো সংসার বড় হয়েছে।

আমার জন্যে কেউ বসে নেই। এক শুধু মা!' এখানে হেসে ফেলল সরমা। এক ঝলক জলতরঙ্গের পরেই এইভাবে একটি মেয়ে রেডিওতে হাসে—'হু হু হু—আমি চারমিস সুন্দরী—,' প্রায় সেই গলা, 'জানো নীলুদা মা আজকাল আমাকে ভীষণ আঁকড়ে ধরেছে। টবের ফুলগাছকে মানুষ খরার দিনে এমন চোখে চোখে রাখে—হারাতে চায় না এক মিনিট! পাছে কোন বেয়াড়া গরু-ছাগল আগাগোড়া মুড়ো করে খেয়ে যায়! পাড়ার কোন ছেলে মিশতে এলে সব কাজ ফেলে মা সামনে এসে বসে থাকে। এক সেকেণ্ড নড়বে না। আমি যে ফুলের তোড়া। ফুলদানিতে থাকি! আসলে কি জান—আমি ছাড়া মায়ের কেউ নেই। ভীষণ অ্যাজমার টান। আমার বিয়ে হয়ে গেলে মাকে কে দেখবে?'

নীলকান্ত এতক্ষণ প্ল্যান করছিল, কোথায় একটু ফাঁকা অথচ আবছা জায়গা পাওয়া যায়। কতকাল সরমাকে চুমো খায়নি। এতদিন পরে জড়ালে কেমন লাগবে। ভারি উরুসুদ্ধ এই সরমা কেমনভাবে কতখানি আবেগে তাকে নেবে। মেয়েটার এই শেষের কথাগুলো তাকে অপরাধী করে দিল। ভীষণ সেলফিস লাগল নিজেকে। মুর্গির কথা একটুও চিন্তা না করে লোকে এভাবেই ফাউল কবিরাজি খায় রেস্তোরাঁয়।

চোখে জল এসে পাকবে। 'শুকনো ঘাসের গুঁড়ো উড়ছে বলে সরমা রুমাল বের করে মুছে ফেলল। আয়না ছাড়াই ব্যাগ খুলে আন্দাজে নিখুঁতভাবে পাফ বুলিয়ে নিল।

'বড়দা তোমার বিয়ে দিয়ে দিলে পারতেন।'

'টাকা কোথায়?' শেষে বলল, 'বিয়ের মত হয়েছিল দু'বার। এতদিনে ছেলেমেয়ে ইস্কুলে পড়ত হয়ত। বৌদির জন্যে হল না।' নীলকান্ত তাকিয়ে আছে দেখে বলল, 'বৌদির ভাইদের মনে আছে।'

'একজনকে ভীষণ হিংসে করতাম। সাদা ট্রাউজার্স পরে আসতো!'

'মেরিন ইনজিনিয়ারিং পড়ছিল। একদিন। জাহাজ দেখাতে নিয়ে গিয়ে পোর্টহোলের সিঁড়িতে আমায় জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়েই পালালো। অচেনা জাহাজে শেষে আমি খুঁজে বেড়াই। বৌদি কি করে বুঝেছিল কে জানে। ট্রেনিং শেষ করে বেরোতেই সাত-তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিল ভাইয়ের।'

'আরেকজন?'

'সেও বৌদিরই ভাই। বাঁধাঘাটে তিনপুরুষের লোহার কারবার। সেখানে বিয়ে হলে সুখেই থাকতাম হয়ত। বৌদিই ভেস্তে দিল। নইলে লোকটা মন্দ ছিল না। একটু যা বেশি বয়েস। আমায় খুব মনে ধরেছিল।'

বেহালায় প্রথম স্টেটবাসের প্রথম যাত্রী নীলকান্ত। দোলনার সরমা, সিউড়ির না-দেখা সরমা, বর্ধমানে ভূগোল মুখস্থে ব্যস্ত সরমা—এই তিনজনই বেহালায় থাকে। তখনও শহরতলিতে গাছপালা ছিল, ছিল বাঁশবাগান, পানাপুকুর, লাল সুরকির নির্জন রাস্তা। মন খারাপ হলে ভাবতে ভাবতে হাঁটা যেত।

রাইসামল ওনার বাড়িটা বানিয়েছিল ভাল। অনেক ঘর—ঘোরানো বারান্দা—কত কি। বিশুর খোঁজে গিয়ে একদিন দুপুরে সরমাকে একা পেল। উপুড় হয়ে পড়ছে। সামনে খোলা বই। নীলকান্তকে হঠাৎ ঘরে দেখে তড়াক করে উঠে বসল। হাতে ছুরি থাকলে নীলকান্ত সেদিন সরমার বুকে বসিয়ে দিত। এমন তিলে তিলে অপেক্ষার একটা হেস্তনেস্ত করবে বলে ঠিক করে ফেলল।

অন্যদিন কি করতো নীলকান্ত জানে না। খুব সহজেই এগিয়ে গিয়ে সেদিন সরমার হাত ধরেছিল, 'তুমি যে আমাদেরই মত মানুষ—আজ না ছুঁলে বুঝতেই পারতাম না।' আর কথা বলতে পারছিল না নীলকান্ত। আরও সহজে—ভাল ভাষায় যাকে বলে গ্রীব—সেখানে নিজের গরম ঠোঁট বুলিয়ে দিল। শেষে ভারি সহজে সরমার ঠোঁটে নিজের ঠোঁট চেপে ধরল।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সরমা বলল, 'আমায় তোমার এতদিন কি মনে হত তাহলে? পরী? পেত্নী?'

মানুষ বলে ভাবিনি কোনদিন—'

'তুমি বুঝি কবিতা লেখো নীলুদা?'

ঘরে কে এসে পড়ায় কিছু বোঝার আগেই সরে গিয়েছিল সরমা। তারপর নীলকান্ত সেভাবে আর একা পায়নি সরমাকে। কিছুদিন পরে একখানা চিঠি পেয়েছিল। ব্লাক খাতার পাতায় লেখা।

'তুমি কি চাও বুঝি। আমাদের এখন অপেক্ষার সময়। আশীর্বাদ কর যেন পরীক্ষায় পাস করিতে পারি। তুমি সেদিন বসিয়া বসিয়া ছোড়দার চিলেকোঠায় গরমে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলে। তোমার কপাল, মুখ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছিল। আমার মুছাইয়া দিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। ভালবাসা নিও। প্রণাম লও।'

চিঠি পড়ে নীলকান্ত আনন্দে আটখানা। পনের ষোল বছর আগে বাপের আদরের দুলালী ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থিনীর ভালবাসার ভাষা ছিল এর কম। তখন সিনেমায় সন্ধ্যারানী, উপন্যাসে তারাশঙ্কর, ফুটবলে মান্নার শট নিয়ে লোকে কথা বলত। মন্ত্রীর ভাষণ খানিকটা 'সরিয়াসলি নিত—আর তাঁরা ভাষণও দিতে শুরু করেছে গণ্ডায় গণ্ডায়।

শিবপুজোর দিন সরমা উপোস করে নীলকান্তকে খাওয়ালো। কেউ কিছু মনে করেনি। গোপনে একটা কাঁচা টাকা দক্ষিণাও দিয়েছিল কাকী—একবার প্রণাম। আনাড়ি নীলকান্ত নিজেকে স্বামী ভেবে বসেছিল—অন্তত ভাববার চেষ্টা করেছিল। অথচ সে-ভাব পুরোপুরি আসতে চায়নি। নিজেকে তখন আয়নায় মনোহর লাগতো। চিরুনির ওলোটপালটে মাথার চুল অন্য মানে পেয়ে যেত।

এই সময় থেকেই বিশুদের বাড়ির হাওয়া পালটাতে থাকে। এককালের পড়ুয়া দারোগা অনন্ত মিত্তির রিটায়ারের মুখে মুখে

মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরতে শুরু করল। বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নেমেই চেঁচাতে লাগল, 'চোপরাও শালা। কোন বেয়াদবি সহ্য করব না! আমাকে সবাই ঠকিয়েছে এতদিন।'

সরমার মা অ্যাজমায় কাহিল। বিছানায় বসে এসব শুনে কাঁদতো। ছোটমাসি বেরিয়ে গিয়ে হাত ধরে বেচাল জামাইবাবুকে ভেতরে টেনে আনতো। নীলকান্তর মন খারাপ হয়ে যেত। তার এসব একদম ভাল লাগতো না। কিন্তু আপত্তি করার সে কে? বিশুর ছোটবেলার বন্ধু? সরমার ভালবাসার নীলুদা?

এই সময় থেকেই বিশুও বাড়াবাড়ি রকমের মিথ্যেকথা বলতে শুরু করে। একটা মিথ্যে ঢাকতে দশটা বলে। মিথ্যের জালে শুধুই জড়িয়ে পড়ে। নিজেকে খুব বড় ভাবে। বোঝাই যাচ্ছিল, দুপুরের দিকে রেসে কোন ঘোড়ার পেছনে মোটা টাকা চাপিয়ে দিয়ে বিশু ভাবতো—সন্ধেবেলা মোটা পেমেন্টে সে বড়লোক হয়ে গেছে। তখনকার বিশুর পক্ষে ঘোড়ায় লাগানো মোটা টাকা মানে বিশ পঞ্চাশ। কমতে কমতে তা পাঁচ আনায় এসে ঠেকেছিল। মোটা পেমেন্ট তার কপালে কোনদিনই হয়নি। অথচ পেয়ে গেছে ভেবে, নিজের বানানো জগতে বাস করতো। ফলে সব কথাই মিথ্যে বলতে হোত। ঘেন্নায় নীলকান্ত বিশুর সঙ্গে মেশাই ছেড়ে দিল। সরমাদের বাড়িটা ভেতরে ভেতরে ঘুণ ধরে ঝরঝরে হয়ে গেল। আউটসাইডার বলে নীলকান্তর কিছুই করার নেই।

শুধুই ছোটমাসি যা কিছু উচ্ছল।

দু'জন মাউন্টেড পুলিশ ঘোড়া খট্‌খট্‌ করে রাস্তা পার হয়ে গেল।

'নীলুদা, আর কিছুদিন পরে ভুলে যাবে বলছিলে কেন?'

'সে তুমি বুঝবে না।'

'বলই না'

আমি ছেলেমেয়ের বাবা। আমাকে নিয়ে তোমার বৌদি নতুন

কিছু লোকজন হয়েছে। তাদের ছাপ পড়ছে আমার ওপর। তখন কি আর পুরনো হাওয়া আমায় ছুঁতে পারবে?'

'তুমি নিশ্চয়ই কবিতা লিখতে কোনদিন?'

'এজন্যে কবিতা লেখা লাগে না কোনদিন। এই তো দেখনা আজ আমার পকেট বাছুরের চেনে ভারি হয়ে আছে।'

'থাকলোই বা।' আরও কিছু বলত হয়ত। কিন্তু সরমার মুখে কিছুই ফুটলো না।

আমি অফিস থেকে ফিরে বড় বঁটিতে খড় কাটি। রোববার সকালে কুকুর চান করাই। পুকুরে পঁয়ত্রিশ কেজি মাছ ফেলেছি। মাঝে মাঝে ওদের জন্যে খাবার দিই জলে। তারপরেও তোমার বৌদি আছে। আমার দুই ছেলেমেয়ের পরিচয় আমিই—ভাবতে কেমন অবাক লাগে না?'

'অবাকের কি আছে। মানুষ নিজেকে এভাবেই ছড়ায়। আমিই শুধু কোথাও কোন শেকড় বসাতে পারিনি নীলুদা। তুমিই বোধহয় আজও আমাকে পরী ভাব! অথচ রোজ মেয়ে বলে আমি পাউডার মাখি, আয়নার কাছে হয়ে চুল বাঁধি, সুরমা টানি—আজকাল আমার বমি আসে।'

নীলকান্ত এই কথা বলার পাখিটার দিকে তাকিয়ে ছিল। আঁচল টাইট করে কোমরে পেঁচানো। ব্লাউজের টিপকল খুলে গিয়ে নরম মাংসের দুই স্তূপ সাদাটে ব্রেসিয়ার তছনছ করে দিচ্ছে। শাড়িটা জ্বালি জ্বালি বলে নীলকান্ত চোখ ফেরাতে পারছিল না।

'শিশু ছবি তুলবে বলে আমাকে সাইকেল অ্যাকসিডেন্ট করতে হোত—মনে আছে?'

'খুব! আমাকে দেখবার জন্যেই তুমি আছাড় খেতে!'

'তুমি বুঝতে পারতে?'

'ভুলে যাও কেন—আমি অন্য কিছু নয়—একটি মেয়ে মাত্র।'

বিশুর একটা বক্স ক্যামেরা ছিল। বাড়ির সামনের পানাপুকুর

ঘেঁষে একটা খেজুর গাছ পুকুরের মধ্যে হেলে পড়েছিল। অনন্ত মিত্তিরের দারোগা জীবনের ভাঙা সাইকেলটা চালিয়ে নীলকান্ত গিয়ে গাছটার গুঁড়িতে কলিশন করবে এবং সেই ধাক্কায় উল্টে পড়বে। এই অনির্বচনীয় মুহূর্তটি বিশু তার বক্স কোডাকে তুলতে আরও অনির্বচনীয় আনন্দ পেত। সেখানে নীলকান্তর রোল ছিল আগাগোড়াই গাড়লের। টেক এবং রিটেক করতে গিয়ে বিশু বারে বারেই নীলকান্তকে আছাড় খেতে বলত। নীলকান্ত অবলীলায় দুপুরের পর দুপুর একই সিনে আছাড় খেত। কেননা ওই অভিনয়ের দর্শক ছিল সরমা—নিরাপদে ঘরের জানালার ধারে বসে দেখত আর কলিশনের পর দুর্ঘটনায় আহতকে দেখে হাততালি দিয়ে হাসতো। ছড়ে গেলে দু-একদিন টিংচার আইডিনে তুলো ভিজিয়ে সরমা এনে দিয়েছে। খাঁটি আহতের মত নীলকান্ত তা কাটা জায়গায় লাগিয়েছে।

আরও একজন বেহালার দুপুরে এই সুটিং দেখতো। সে ছোট মাসি, কালীসাধিকা। তার শোয়ার খাটে মাথার কাছে—কালীর পট। বিশু বলত, 'জানিস নীলু ছোটমাসি 'লুকি' মন্তর জানে। হাতে তালি বাজিয়ে লুকিয়ে যাবে। খুঁজেও পাবি না।'

নীলুদেরই বয়সী হবে—হাওড়ার গাঁয়ের এই সামান্য মেয়েটি সেদিন রহস্যের বাণ্ডিল ছিল। একদিন ফাঁকা বাড়িতে ছোটমাসি 'লুকি' মন্তরে হাওয়া হয়ে যাচ্ছিল—অন্যরা কোথায় সিনেমা না কি দেখতে গেছে। নীলু হঠাৎ গিয়ে দেখে মাসির মন্তরের খেলার খেলুড়ে বিশু ফাঁকা বাড়িতে অধীর হয়ে বসে। গা গরম। তাকে সামনের ঘরে বসতে বলে বিশু লুকি মন্তরের টানে ভেতরে গেল। আর আসে না। শেষে নীলকান্ত উঠে গিয়ে দেখে, মাসি একেবারে হাওয়া হয়ে যায়নি। যেটুকু দেখা গেল, দক্ষিণের ছোট ঘরটায় মাসি আগোছালো হয়ে শুয়ে। বিশু তার উরু, কোমর, বুক—ডলাইমলাই করে দিচ্ছে।'

'লুকি' মন্তরের ঝাঁজে মাসি কিছু ক্লান্ত ছিল। শুয়ে শুয়েই ডাকলো,

'এসোনা এখানে। বোস নীলু।' ভাগ্যিস সেদিন ফুলপ্যান্ট পরে যায় নি।

বিশুই বলল, 'আমার হাত ব্যথা হয়ে যাচ্ছে। তুই ওদিকটা টিপে দেনা।'

নীলু দিয়েছিল। বিশু জল খেতে উঠে গেল। ওর কপালে একটা শিরা স্থায়ী বিদ্যুৎ হয়ে সর্বক্ষণ ঝিলিক দিয়ে জেগে ছিল। নীলুর হাত ছোটমাসি বুকের ওপর টেনে নিল, 'তুমি সরির জন্যে আসো—তাই না! সব বুঝি।'

নীলু চুপ করে ছিল। মাসির বাঁ বুকে তার ডান হাত চোদ্দ পার্টিশনের হাতুড়ির ওজন নিয়ে মুঠো হয়ে পড়ে থাকলো।

জামা নেই গায়ে। মাসি খুব ঢিলেঢালা হয়ে শুয়েছিল, 'সরি তোমাকে চায়?'

'জানি না।'

'আমি জানি।' খুকখুক করে হাসলো মাসি। তারপর এক ঝটকায় নীলকান্তকে বুকের ওপর টেনে নিয়ে রোঁয়া ওঠা ঠোঁটে তার একুশ বাইশ বছরের হাঁ-মুখ সবটাই কামড়ে ধরলো, 'কী ভালো যে তুমি নীলু।' মাসির কথা জড়িয়ে গেল।

তারপর আর কোনদিন নীলকান্ত মাসির 'লুকি' মন্তরের খেলুড়ে হয়নি। এখন জানে এসব মানুষের জরাজরি, রোগ শোক তাপের চেয়ে বেশি কিছু নয়।

'মাসের বিয়ের রাতের কথা মনে আছে সরমা?'

'আমাদের সংসারে কুগ্রহ হয়ে এসেছিল মাসি। আজও যায়নি।

নীলকান্ত তাকিয়ে আছে দেখে বলল, 'ছোড়দা তো এখনও মাঝে মাঝে মাসির শ্বশুরবাড়ি যায়। শুনেছি, দু'জনে দেখাসাক্ষাৎও ঘটে।'

'তুমি কিছু জানো? আমি যখন যেতাম—বিশুর সামনেই মাসি লুকি' মন্তরে অদৃশ্য হয়ে যেত—'

'যত্ত বুজরুকি নীলুদা। আসলে স্বভাব খারাপ ছিল। মা তো তাই ওর কথা উঠলে আজও কাঁদে—'

'তখন কি কি ঘটেছিল— তুমি সব জানতে? বুঝতে?'

'আন্দাজ করেছি। পরে বুঝেছি। বাবা তো ওর জন্যেই অমন হয়ে গেল। শেষে ছোড়দাও।'

রিটায়ার করেই অনন্ত মিত্তির যেসব মামলায় পুলিশ আসামী— তার তদ্বির-তদারক, সওয়াল জবাবে নেমে পড়ল। কাঁচা পয়সা আসতে লাগল। তবে সবই ব্যাকগ্রাউণ্ডে থেকে করত। কেননা, ওকালতির ডিগ্রি ছিল না অনন্ত মিত্তিরের। পাতার পর পাতা অনন্ত মিত্তির সামনের ঘরে বসে ডিক্টেশান দিত। টাইপিস্ট তিন চার কপি করে টাইপ করত। সে সব জবাবে মাঝে মাঝে বাংলাও থাকত। মনে আছে একদিন বিকেলে অনন্ত মিত্তির ডিক্টেশন দিচ্ছিল, 'দেন দি অ্যাকিউজড্ সেইড— হারামজাদা তামাশা পায়েছো।'

সরমা বলল, 'বাবা সারাদিন মামলার বয়ান শুনতো, কেস হিস্ট্রি সাজাতো। দূর দূর থানার এস আই, পুলিশ বিপদে পড়ে আসতো। ঘন ঘন চা, জলখাবার দিতে মাসি ও-ঘরে যেত। ক'দিন শীতের রাতে বাবার জন্যে গরম জলও দিয়ে এসেছে সামনের ঘরে। বাবা পা ডুবিয়ে বসে থাকত। শেষদিকে মদও খেত সন্ধ্যের পর—'

'তুমি তোমার বাবারটাই বলছ। কিন্তু বিশুর কথা কিছু জানতে না।'

'সব জানতাম না। কিন্তু একদিন জেনেছিলাম—বাবাকে ছোড়দা —কিংবা ছোড়দাকে বাবা ধরে ফেলেছিল একদিন। তারপর থেকেই বাবা মদ খেলেই চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করত—'আমায় সবাই ঠকাচ্ছে' —নেশা হলে ওই এক বুলি মুখে—'

অনন্ত মিত্তিরও 'লুকি' মন্তরে জড়িত—তা আজই প্রথম জানলো নীলকান্ত। এখন অবাক হওয়ার ক্ষমতা কত কমে গেছে।

অথচ আগে কত অল্পেই অবাক হত। আচ্ছন্ন হত।

ছোটমাসির বিয়ের রাতে সুরকির অন্ধকার রাস্তায় বিশু চাকু হাতে ঘুরে বেড়িয়েছিল। রিটায়ার হলেও সদর এস পি সাহেবের শালির বিয়ে। মাচা করে সানাই বসেছিল। কড়া আলোর নীচে চন্দনে সাজানো মাসি দূরে দূরে নীলকান্তকে দেখে ফিক্ করে হেসেছিল। মাসির তুক্‌তাকে বেচাল বিশু চাকু হাতে বাইরে ঘুরছিল। মাসিকে পেলেই বসিয়ে দেবে। সামনে সামিয়ানার নীচে অনন্ত মিত্তিরের পুলিশ জীবনের বাছাই বন্ধুরা ধুতিপাঞ্জাবিতে মোলায়েম মৌজে বসে। সবকটিই ঝানু বদমাইশ। মাছ হয়েছিল তিনরকমের। নীলকান্ত চিংড়িমালাই চেয়ে চেয়ে খেয়েছিল।

বিয়ে হল স্বরূপনগর-সংগ্রামপুর বাসরুটে একজন বছর পঁয়ত্রিশের জোয়ান রেশনশপ মালিকের সঙ্গে। উদ্যোগী লোক। সঙ্গেই স্টেশনারি দোকান। নিজে ভিলেজ ডিফেন্স পারটির ক্যাপ্টেন। শরিকী পুকুর ছাড়াও নিজের দু-দুটো পুকুর।

বিশু একবার নিরুদ্দেশ হওয়ার পর অনন্ত মিত্তির বিপন্নপালক বন্ধুর বাড়ি ছুটতে ছুটতে এসেছিল, 'আমার মন ভাল নিচ্ছে না। আপনার ছেলে নীলুকে একবার স্বরূপনগর পাঠাতে হবে—ভাল ঠেকছে না।'

নীলকান্ত ইচ্ছামতি পার হয়ে স্বরূপনগর গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে মাসির শ্বশুরবাড়িতে নিজের চোখে এসব দেখেছিল। গিয়ে খবর পেয়েছিল, বিশু এসেছিল, তবে ফিরে গেছে।

মাসির বর তখন দোকানে। ফাঁকা বাড়িতে মাসি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর একটা কথা বলেছিল। বিশুর কথা উঠতে বলেছিল, খুব অবহেলায়, 'নীলু, তোমার বন্ধুটি তো চিরকালের বদমায়েশ—'

শেষে ছোটমাসির মুখে একথা শুনে নীলকান্ত বোবা বনে গিয়েছিল।

বিশুকে পাওয়া গেল কলকাতায়। ওয়েলেসলির মোড়ে এক গ্যারেজের নীচে জুয়োর আড্ডায়। ততদিনে বিশু ওদের চিলেকোঠার

ঘরে রেসের বই, পোড়া সিগারেট আর পাট-চুকোনো এম বি পড়ার মড়ার খুলি, উরুর হাড় ছড়িয়ে পরিষ্কার সবাইকে বুঝিয়ে গিয়েছে—তাকে নিয়ে আর কিছু আশা করা উচিত নয়।

ওয়েলেসলি স্কোয়ারে বিশু সেদিন সারারাত ধরে তার নিজের কথা বলেছিল। মাসিই তাকে দু'বার ডেকে ডেকে মা হয়েছিল। শেষবার বাচ্চাটা নষ্ট করতে মাসি শেষরাতে উঠে স্কিপিং করত। বিশুর মুখে শুনতে শুনতে নীলকান্ত মিলিয়ে নিচ্ছিল মনে মনে। ছোট মাসিকে সে তো স্কিপিং করতে দেখেছিল—খুব ভোরে। মুখে তো তার কোন ভয়ের ছায়া ছিল না।

'ছোটমাসি কোমরে বেল্ট বেঁধে কাপড় কাচতো ধুপধাপ করে—যদি পেটের বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে যায়। এই অবস্থায় তুই বল নীলু—কি করে পড়াশুনো করি। মাথার ঠিক থাকে।'

তখন একবার বিশুকে দেখেছিল নীলু। অমাবস্যার রাত। বাড়ির সামনের মাঠে শুয়ে আছে। বহুকাল বৃষ্টি হয় না। ঘাসগুলো কতদিন খরখরে হয়ে আছে। ভেতরের বারান্দায় সরমা অরগ্যাণ্ডি কাটছিল কাঁচি দিয়ে—ব্লাউজ বানাবে। তখন বিশু শুধু হাই তুলতো—কোথাও একমিনিট বসতে পারতো না। কারণ ধরতে পারেনি নীলকান্ত সেদিন। অনেকদিন পরে ওয়েলেসলির মাঠে বসে সব বুঝতে পেরেছিল।

'প্রথম বাচ্চাটা হল মাঝরাতে। মাঝরাতে। বাড়ি ভর্তি লোক। অসম্ভব সহ্যশক্তি ছিল মাসির। বোঁচকা বেঁধে সেই অবস্থায় সামলে নিয়ে পালপুকুরের পাড়ে এল। ওর বুদ্ধিতে ইঁট নিয়ে এলাম তিনখানা। সবশুদ্ধ বেঁধে পুকুরে ফেলার আগে একবার আমার প্রথম বংশধরের মুখ দেখার ইচ্ছে হল। একটা পুরো দেশলাই খরচ করে মরা ছেলের মুখ দেখলাম; চোখ ফেরাতে পারি না। ছোট মাসি তখন আমায় চুমো খেয়ে বলল, খুব করুণ করে—'লক্ষ্মীটি ফেলে দাও। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।'

সেই মাসি নীলুকে বলে দিল—তোমার বন্ধু তো চিরকালই বদমায়েশ !

'দুসরাটাও ছেলে। ছোটমাসি নিজেই বোধহয় গলা টিপে মেরেছিল। কেননা আমার ঘুম ভেঙেছিল বাচ্চার কান্নায়। মা উঠে পড়ে একেবারে সামনে দাঁড়াল। মাথা তুলতে পারি না। মা ফিট হয়ে যাওয়ার শ মিল। মাসি মাকে ধরে ঘরে নিয়ে গেল। আমি বোঝাটা নিয়ে শেষরাতে সরলপোতায় গিয়ে ফেলে দিয়ে এলাম। আমার জীবনটা যদি ফিরে শুরু করা যেত নীলু—'

'তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে না ? বৌদি শেষে ভাববে।'

'একদিন ভাবুক। তোমার ন. ক্লিনিকে যাওয়ার কথা ছিল ?'

'একদম ভুলে গেছি নীলুদা।'

'এখন আর যাওয়া যায় না ?'

'না ! অপারেশন হওয়া দরকার। অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশন হবে। সিট নেই। একজন ডাক্তার খুব চেষ্টা করছে। সেও ফেল মেরে গেল বোধহয়।'

'বয়স কত ? ডাক্তারের—'

'তুমি এখনও হিস্টুটে—' বলতে বলতে সরমা নীলকান্তর হাত ধরে ফেলল, 'আজকের সন্ধ্যায় অন্য কোন কোশ্চেন তুলো না। ভাল কথা—তুমি চুমো খাবে বলেছিলে—'

'ইয়েস। ছাখো তো। কেমন দু'জন বোকার মত বসে বসে সময় কাটাচ্ছি। তোমারও ফিরতে হবে। আমারও ট্রেন ধরা আছে।'

ওরা দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে অন্ধকারের দিকে এগোলো। একটুখানি অন্ধকার চাই। দু'পাশে চিরাচরিত অন্ধকার পড়ে আছে। সাঁ সাঁ মোটর ছুটে যাচ্ছে। গঙ্গায় নিষ্কর্মা জাহাজগুলো জায়গা জুড়ে আছে। ফোর্টের গায়ে উঁচু মত জায়গায় কিছুক্ষণ বসে নীলকান্ত কতকাল পরে সরমার ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরল। তিন চার সেকেণ্ডের বেশি রাখা গেল না। সব সময় লোক যাচ্ছে।

'ছোড়দা বলছিল—তুমি খুব বড়লোক হয়ে গেছ।'

'মোটেই না। তবে পাল্টে গেছি অনেক বলতে পার। আজকাল গোয়ালে ঢুকে গরুদের খাবার দেবার সময় ওরা যখন কৃতজ্ঞতায় চোখ তুলে তাকায়—তখন মনে হয়—জীবনের এতগুলো বছর কি ভাবে নিষ্ফলে কেটেছে।'

'দুধ হয়?'

'হুঁ। গোবর হয়। সবজি চাষে—ধান চাষে লাগে। পুরনো গোবর মাছকে দেওয়া হয়। ওরা ঠুকরে ঠুকরে খায়।'

'তুমি এত গেরস্থ হয়ে গেলে কি করে? ভাবাই যায় না।'

'তোমার বৌদির জন্যে। মানুষটা এত ভাল। চোখ তুলে তাকালে অসম্ভব গর্জাস—মহারানী পদটার্নের লাগাবে। অবশ্য সে কথা ওকে কোনদিন বলিনি।'

'সেই একবার নিয়ে গিয়েছিলে। কি ভাল যে লেগেছিল।'

'মিথ্যে বলছ কেন সরমা। তখন তো তোমার ওকে দেখে বুকে কষ্ট হওয়ার কথা।'

'তা একটু হয়েছিল। তবু মনে হয়েছিল—মানুষটা খুব ভাল।'

'আজও যদি তুমি বল—সরমা, আমি সব ফেলে চলে আসতে পারি। নীলকান্তর বুক পকেটে তখন রেলের মাস্থলিখানা গজগজ করছে। তাতে স্টেশনের নাম, নিজের বয়স, সই, সব লেখা আছে। এখন এই মুহূর্তে সে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মত ভালবাসা ট্রান্সফার করতে পারে।

'তোমার এতদিনের বউ! ছেলেমেয়ে?'

'ওদের জন্যে কষ্ট হবে ঠিকই ভীষণ কষ্ট হবে। রেখার তো ফল্ট নেই কোন। ছেলেমেয়ে আমার সঙ্গে খেতে বসতে ভালবাসে। তবু সরমা—আমি চলে আসতে পারি। তোমার সঙ্গে আমি কোনদিন থাকিনি। কেন সেদিন ফিরিয়ে দিলে সরমা। তাহলে আমাকে ঘিরে কয়েকজন নতুন মানুষের জট তৈরি হত না।'

'বুঝিনি। আমি সব বুঝিনি। আমার কোন উপায় ছিল না নীলুদা।'

'আমার এখন মনে পড়ে—আমি চিলেকোঠার ঘরে বসে ঘামছি। মাথার ভেতর থেকে ঘামের ফোঁটা গড়িয়ে এসে ভ্রূতে মিশে যাচ্ছে।'

আলোর তোয়াক্কা না করে সরমা মুহূর্তে ঘাসের মাঠে নীলডাউন হয়ে যে কোন ছিন্ন-অঙ্গ প্রাচীন পাথুরে নারী মূর্তির মত ঠেলে উঠল। সরমার হাত নেই, পা নেই। উরু আছে, নিতম্ব, বুক, গ্রীবা, ঠোঁট, টাইট সিঁথিতে ঢাকা মাথা আছে শুধু। 'আমাকে নিয়ে তুমি সুখী হবে না নীলকান্ত।'

এইসব সময় হিরোইনের চোখে জল থাকে। তাই হল প্রথা। সরমারও ছিল। কিন্তু নীলকান্ত হাত দিয়ে দেখতে সময় পেল না। ফোর্টের ভেতর থেকে হেডলাইট জ্বালিয়ে একখানা দশচাকার লরি ফুলাস্পডে বেরিয়ে এসে রেডিও স্টেশনের দিকে চলে গেল। মোড় ঘোরার সময় দু'সেকেণ্ডে ওদের দুজনকে আলোয় ভাসিয়ে দিল।

আধখানা উঠে বসে সরমা ময়দানে গেঁথে যাওয়া কোন পুতুল হয়ে ছিল। নেমে বসল, 'আমার আর কিছু নেই নীলকান্ত।'

'আমারই বা কি আছে সরমা।'

'আমি মেয়ে হয়ে তোমাকে চলে আসতে বলতে পারি না। চলে এসে আমাকে যদি বাজে—নষ্ট লাগে? তখন? সে আমি পারব না। তার চয়ে এই বেশ আছি। কি বল! তুমি বরং এক কাজ কর—আমার নামে ব্যাংকে একটা ভালো টাকার অ্যাকাউন্ট খুলে দাও। ইচ্ছেমত চেক কাটবো। এই হিসেব আর আমার ভালো লাগে না।'

'ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নয়। তোমার দরকার একখানা দোতলা বাড়ি। একতলা ভাড়া দিয়ে বাড়িওলি হয়ে থাকবে—'

'সে তো অনেক টাকা নীলুদা। তোমার অত টাকা আছে?'

'ছিল একদিন। বিজিনেসম্যান হলে আটকে রাখতে পারতাম।

আন্দাজে এসেছিল। আন্দাজে খরচ হয়ে গেল। থাকলে আজ তোমার কাজে লাগতো।'

'তাহলে আমার চলবে কি করে?'

'মাথা খাটাতে হবে।'

'খাটালেই আসে বুঝি!'

'আমার আসে সরমা। মন দিয়ে চাইলে সব আসে। একদিন তোমাকে কত মন দিয়ে চেয়েছি—আজ তো তুমি এসেছ। সেই এলে—তবে বড় দেরিতে!'

'এখনও আমরা পুরনো হইনি। দেরি কোথায় দেখলে!'

'তাহলে একসঙ্গে থাকবে? সত্যি বল। আমি এতদিন পরে এমন ছাড়াছাড়ি করে মিশতে পারি না। এ কেমন দেখা হওয়া? তোমাকে জড়িয়ে শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে! ঘুমিয়েও পড়তে পারি তখন।'

'তোমার চেয়ে আমার কষ্ট বেশি বল। তাই না? আমি কি পেলাম এতদিনে!' নীলকান্তকে এবার অনেকদিন পরে ভাল করে দেখে নিল সরমা। ঘাড়ে পাঞ্জাবির সরু-রেখার বাইরে ময়াম মার্কা পাতলা কিছু মাংস। গালে তৃপ্তির প্রলেপ। চোখ দুটো যে কোন ঠাট্টায় এখুনি হেসে উঠতে পারে।

বিয়ে ব্যাপারটা এই কিছুকাল সরমার কাছে আর কোন মানে পায় না। নিজের দিকে ফিরে তাকিয়ে শুধু টানা একখানা মাঠ দেখতে পায়। কেউ তাকে অনেকদিন ধরে মেখে রেখেছে এলো-পাথাড়ি। এখানে গর্ত—সে-জায়গাটা উঁচু—তারপর খানিক মানে হয় না এমনভাবে ছড়ানো। অনেকে এভাবেই আটা ময়দা মেখে রাখে।'

'সারাদিন আমার কাছে বউ হয়ে থাকতে পার এমন একটা ফ্ল্যাট চাই।'

'সে যে ভয়ঙ্কর নেশা নীলকান্ত। লোকে আর ফেরে না—'

'রাত হলেই বাড়ি ফিরে যাব। আমিও ছেলে মেয়েদের ছেড়ে থাকতে পারিনে—'

'ওদের মা?'

'বেশ অনেকদিন তো আছি রেখার কাছে। দেবার বেলায় কোন কিপটেমি করিনি তার সঙ্গে।'

দুজনই জানে এসব ব্যাপার এমন মাঠে বসে ঠিক করা যায় না।

তাই নীলকান্ত কোনকিছুর পরোয়া না করেই সরমার বুকে হাত রাখল। সেখানে মাথা ঘষে দেখল, সাধ মেটে না কিছুতেই। শেষ হয় না। একটা জায়গা দরকার। একখানা ঘর। আগাগোড়া খুলে দেখা দরকার—সরমা কিরকম? সরমা কেমন?

॥ ৪ ॥

ভোরে উঠে রেখার অনেক কাজ থাকে। সুরেন বিজয় হনুমান হলেও বাড়ির ছেলের মত। বড়ছেলে হস্টেল থেকে ফিরলে তার সঙ্গে ওরা ভাইয়ের মত খেলে। নিজের ছেলে আর সুরেন বিজয়কে সকালে জলখাবার দেবার সময় সমান মাপের বাটিতে ছাতু, কলা, দুধ মেখে দেয় রখা। এঁড়ে বাছুর সুধীর এসব দেখতে পেলে চেঁচাবে। তাকে কলার খোসাগুলো দিতে হবে। নিজেদের জন্যে দুধ তুলে রেখে ওপরে কুয়োর জলে দুধ ঢেলে দেওয়া হয় আলাদা বাসনে। সঙ্গে দুটি ভাত, নাহলে আবার খেতে চায় না।

মেয়েটা শোয়ার ঘরের মেঝেতে চক দিয়ে 'অচল, অধম' লিখছিল। নীলকান্তর ঘুম ভাঙেনি। রেখা দু'কাপ কফি ঢেলে নিয়ে ওর ঘুম ভাঙালো। নীলকান্ত খানিকক্ষণ চোখ খুলে শুয়ে থাকল। তারপর তড়াক করে উঠে বসে এক চুমুকে কফি শেষ করে দিল। উঠে যাচ্ছিল, রেখা দাঁড় করালো, 'আজকাল রোজ তোমার লাস্ট ট্রেন হচ্ছে কেন? মার্চ মাস হলে না হয় বুঝতাম।'

'এক্সপ্ল্যানেশন চাইছো। এসে দিচ্ছি।'

একদম চান করে বেরিয়ে আসার পর নীলকান্তর বুকে পিঠে রেখা পাউডার ছড়িয়ে দেয়। আজ দিতে গিয়ে দেখল, ওর বুকে দু'টো চুল পেকেছে। তারপর কি দেখে বলল, 'একি এসব কি বেরিয়েছে গায়ে?'

এমন বেয়াড়া জায়গায় কয়েকটি ফোসকা পড়েছে—ঘাড় ঘুরিয়েও দেখা যায় না। আন্দাজে নীলকান্ত বলল, 'পোকায় চেটে থাকবে।'

'আজকাল অফিসের পরে কোথায় যাও? সেখানে পোকা আছে?'

তখন তার স্নানসারা টাটকা স্বামী খুব ঘন করে তাকে জড়িয়ে ধরল। নীলকান্ত এখন জানে, রেখা এই ক'দিনের দেরি করে ফেরার কারণ আরও অন্তত কয়েকদিন একদম জানতে চাইবে না। কিন্তু পিঠে কি বেরোলো আবার।

সরমা কাল অনেক কিছু চেয়েছিল।

বিকেলে ওর অফিসে গিয়ে দেখে বড় হলঘরের কোনো ডবল সোফায় খুব আয়েস করে প্রায় ছোকরা মত একজন স্মার্ট লোক বসে। সরমা আলাপ করিয়ে দিল। আফটারনুন ক্লিনিকের সেই ডাক্তার। রোগীর সন্ধানে এতদূর এসেছে। গোঁফ আছে। বিবাহিত। বাবাও ডাক্তার। নীলকান্তকে দেখে বলল, 'আপনাকে অনেকটা ফ্রেঞ্চ ফিল্মস্টার আদিমের মত দেখতে।'

নীলকান্ত অনেককাল সিনেমা দেখেনি। তপন সিংহের 'আপনজন' কোন সিনেমায় এলে দেখে নেবে। আদিম? কে রে বাবা?

কাজ আছে বলে নীলকান্ত কেটে যাচ্ছিল। সরমা লিফট অব্দি ছুটে এসে ওর হাত ধরল, 'কাটাতে পারছি না। উঠলেই আমি যাব। তুমি বরং চাংওয়ার সামনে গিয়ে দাঁড়াও।'

খানিক বাদে সরমা আসতেই নীলকান্ত পুরনো স্বামীর ধারায় দখল নিল। পরিষ্কার বলল, 'আসতে বারণ করে দিও।' একথায় সরমা কতটা কুঁচকে যায়—তাই ছিল নীলকান্তর দেখার ইচ্ছে।

সরমা বলত, 'আচ্ছা ! হাসপাতালে সিট পেতে হলে ডাক্তার তাড়ালে চলে ?'

পর্দা ফেলা ছোট ঘরে বসে নীলকান্ত বলল, 'তোমরা বুঝি এভাবে হার্ডেল ক্রস কর ?' বেয়ারা খানিক পরে একপ্লেট চিংড়ি ভাজা, দুধ বোঝাই উইক কফি দিয়ে গেল।

এসব কোশ্চেনে সরমার মন ছিল না। দামি উপহার দেওয়ার কায়দায় বড় একটা চিংড়ি আধখানা কামড়ে নীলকান্তর মুখের সামনে ধরল। অতএব নীলকান্তকে বাকিটুকু কামড়ে খেতে হল। এ কোন্ সরমা ? চ্যাটালো পিঠে খুব আলগোছে বাসন্তী রঙের একটা খাটো ব্লাউজ কোনক্রমে টিপকলে আটকে আছে। ছুঁলেই পটাং করে সব অগোছালো হয়ে যাবে।

'মা আজ সকালে তারকেশ্বর গেছে। কাল বিকেলের আগে ফিরছে না।'

ট্যাকসি বিশ মিনিটের ভেতর ওদের দুজনকে ফাঁকা বাড়িতে পৌঁছে দিল। সরমা খুব স্বাধীনভাবে শিশির লেমন স্কোয়াস খাওয়ালো নীলকান্তকে। এসব কোথায় ছিল আগে। একথা মনে এলেও নীলকান্ত অবশ্য কিছু বলল না।

পুরু বিছানায় সরমা অনেকখানি জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। নীলকান্ত কোন থৈ পাচ্ছিল না। কোনদিক দিয়ে শুরু—কোনদিক দিয়ে শেষ। ঠাসা শরীর। নীলকান্ত আনাড়ি হাতে কাছে টেনে নিতে সরমা বলল, 'কাছে এস—নয়ত ও পাশে পড়ে যাবে।'

'রোজ এতবড় চৌকিতে একা একা শুয়ে থাকো কি করে ?'

সরমা এবারও কোন কোশ্চেনে গেল না। বদলি করে কটা বয়স্ক চুমোয় নীলকান্ত নামক লোভী, পুরনো, ভীতু ও সাহসী পুরুষটিকে নির্বাক করে দিল। সায়া ছাড়বার পর নীলকান্ত পরিষ্কার বুঝলো, সরমা রেখার চেয়ে আলাদা রকমের মেয়ে। তার বৌ ঢিলেঢালা

ঘাগরা প্যাটার্নের একটা জিনিস পরে। এতই আঁটো—সরমা যেন সায়া নামে এক পরত চামড়াই গা থেকে নামিয়ে দিল।

তারপর সুখে আরামে অনন্ত মিত্তিরের মেয়ে অনেকরকম আওয়াজ করল মাঝে মাঝে। যথা: 'আঃ! উঃ! শুয়ে থাকো উঠছো কেন?' এরপর সরমা যদি, বলত, 'পায়ে পড়ি ওগো—যেয়ো না—', তাতেও অবাক হওয়ার ছিল না কিছু। অনেককাল পরে সরমার জন্যে খুব মায়া হল নীলকান্তর। এই মেয়েটির মাথায় এক-জনের একখানা ছাতা মেলে ধরে দাঁড়ানো দরকার। এইমাত্র সে দানবীর হর্ষবর্ধন হয়েছে।

মাথা আঁচড়ে সোফায় বসল নীলকান্ত। ধুতির কোঁচা হাতেই ঘসে ঘসে সমান করে নিল। সরমা শাড়ি ঢাকা দিয়ে পড়েছিল। চোখ খোলা। থ্যাঁতলানো বেণীর ডগা ফ্যানের হাওয়ায় উড়তে চাইছিল। ফিরে খুব কষ্ট হল নীলকান্তর। অনন্ত মিত্তিরের ছেলেগুলো ছেলে না—গিরগিটি। এখন তো মোটে তিরিশ বত্রিশ। এর পরে কি করবে সরমা। নীলকান্তই বা ইণ্টারভালে উঠে এসে এসে এমন কি করতে পারে।

এই ঘরের বাইরেই বেহালার রোদ্দুর—নিষ্ঠুর বেহালা দাঁত বের করে দাঁড়িয়ে আছে। জীবনটা চকোলেট করে কড়কড় করে চিবিয়ে খাবে। কালই বিকেলে হয়ত নিরুদ্বেগ নীলকান্ত লাউ কুমড়ো বসানোর মাদা কাটাবে মজুর দিয়ে—কিংবা সুরেন বিজয়কে পান্তুয়ার মধ্যে গুঁজে ক্রিমির ক্যাপসুল খাওয়াবে। তখন এই মেয়েটার কি হবে। বাইরে বাস, ট্যাক্সি কি ভীষণ বেগে ছুটে যাচ্ছে।

তখুনি সরমা হুড়মুড় করে খাট থেকে নেমে নীলকান্তর পায়ের কাছে মেঝেতে বসে পড়ল। মাথাটা ওর উরুতে রাখলো। দুই চোখের দুই মণি চলকে একেবারে কোণে গিয়ে পড়ে থাকল। বেণীটা এক রকমের যন্ত্রণা। সেটাকে বাঁহাতে নিজেই টেনে ধরল সরমা। বাইরে তখনও বিকেল ছিল।

'তুমি কিন্তু আমায় ফেলে দিও না নীলকান্ত।'

পাখাটা বুড়ো। খটাং খটাং করে ঘুরছিল। নীলকান্তর শীত ধরে গেল। খুব আস্তে ওর মাথায় হাত রেখে বলল, 'তুমি বুঝি খুব ভয়ে থাকো।'

'ভীষণ। এক একদিন বিছানায় শুয়ে পাতলা ঘুমের ভেতর সারারাত সাঁতরাই—নদীটা কিছুতেই ফুরোয় না—'

'যদি বলি তুমি আঠারো উনিশে কবিতা লিখতে—'

'কোনদিন লিখিনি নীলকান্ত! একবার তোমায় চিঠি লিখেছিলাম। আর তোমার মাকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কানাকেষ্টর গান শুনিয়েছিলাম। আচ্ছা সেসব দিন আর ফিরে আসে না! বাবা তখন আকাশের সপ্তর্ষিতারা চিনিয়ে দিত বই খুলে। হাসপাতালের ডেথ্‌বেডে বাবা নাকি সারারাত আমার নাম করেছিল—সরি আয়! সরি!'

ডিজাইনের গুণে খোলা দুই বুক পাতলা ব্রেসিয়ারে ফুলে ফুলে উঠছিল। নীলকান্ত কোন কথা না বলে ওর পিঠে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।

'আচ্ছা এমন হয় না নীলকান্ত—তুমি আমার পেটে একটা ছেলে দিলে। দু'একমাস হতেই অন্য জায়গায় বিয়ে করলাম। নতুন বর জানলো, ছেলেটা তার। আমি তোমার চিহ্ন নিয়ে অন্য জায়গায় সংসারী হলাম। ফাঁক পেলে তোমার কাছে ছুটে যাব।'

'নতুন লোকও তোমাকে অন্তত একবার তার নিজের একটা চিহ্ন দেবেই। তখন যে সেখানেও বাঁধা পড়বে। আমার কি হবে বুড়োবয়সে?'

'উঃ! কি বিচ্ছিরি অবস্থা ছাখো। তোমার বা আমার—কারও কোনদিকে যাওয়ার উপায় নেই—রাস্তা নেই। কেন যে অত সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে করে বসলে।'

'রেখার তো কোন ফ্লু নেই। সেকথা থাক।'

'বৌদিকে তুমি খুব ভালবাস।'

নীলকান্ত অস্বস্তিতে পড়ল, 'তুমি আমাকে বিয়ে করতে পার না?'

'তাহলে আমার পার্মানেন্ট চাকরিটি খোয়াতে হবে।'

'খোয়ালে?'

'দুটো বউ টানতে পারবে এই বাজারে। তাছাড়া ভালোমানুষ বৌদি মামলাও ঠুকে দিতে পারে। তখন?'

'ওকে বুঝিয়ে বললে রাজি হয়ে যাবে—'

'হয়েছে।' সরমা ফুসে উঠলো, 'মেয়েলোক তাহলে তুমি চেনো না। বুঝিয়ে ট্যাবলেট খাওয়ানো যায়। সতীন গছানো যায় না।'

'রেখা ওয়াণ্ডারফুল লোক। আমার কথা ফেলতে পারবে না।'

উরুর ওপর চিবুকের চাপ দিয়ে বলল, 'কেন এই তো বেশ আছি নীলকান্ত। মাস গেলে মাইনে পাই। ইচ্ছেমত খরচ করি। এই বয়সে রোজকার খরচের জন্যে আমি আর কারও হাতধরা হয়ে থাকতে পারব না।'

'তারপর ভালবাসার একটা ফাউ লোকও আছে—কি বল!'

'একটা কেন? অনেক থাকতে পারতো নীলুদা। বিয়ে করব বলে কাগজে একবার বক্স নাম্বারে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছরের মাত্র চেয়েছিলাম। চিঠির জবাবে জনা দুই এসেছিল। একজন পলিটিক্যাল দাদা মত লোক—আমাকে দেখে চোখ ফেরাতে পারে না—একেবারে যেন মা কালির জন্যে মহাভোগের পাঁঠা কিনতে এসেছে। সে-চোখ দেখলে গা গুলিয়ে ওঠে নীলকান্ত। আমি ফুলকপি না।'

নীলকান্ত একটু একটু করে অনেকক্ষণই সরমার কথায় আহত হচ্ছিল। একসময় উঠে গিয়ে আলোর সুইচ টিপে দিল।

'ভাবার কিছু নেই নীলুদা। সব পুরুষেরই একজন এক্সট্রা বৌ থাকে—সব মেয়েরই একজন এক্সট্রা বর থাকে। এক্সট্রারা ভাবনায় থাকে, স্বপ্নে থাকে। তাদের সঙ্গে মেলাতে গিয়ে আসল জনকে নিয়ে

আমরা দুঃখ পাই! আসল না হয় তোমার জ্যান্ত এক্সট্রা! তুমি আমার আসল এক্সট্রা!'

'বল ফাউ!'

সরমা বেণীটা বাগিয়ে ধরে বলল, 'এখন আমাদের সময় কম। জীবন আর বেশিদিন নেই নীলকান্ত। ঝগড়া করে ক্ষয় হয়ে গিয়ে কি লাভ? তুমি কি নিজেই জান—আমার কাছে কি চাও?'

কিছু বুঝতে না পেরে নীলকান্ত তাকিয়ে ছিল।

'একদা দখল পাওনি—তাই দখলের সুখ! কিংবা মুখ বদলের?

'কি বলছ সরি? তোমার মাথার ঠিক নেই।'

'রক্তের ঠিক নেই বললেও কোন আপত্তি নেই নীলকান্ত। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখ—আমি শুধু একটা মেয়ে বই তো আর কিছু নয়। আমার দেহটা তোমার চেয়ে অন্যরকম—তাই—

এই সরমা স্থলপদ্ম গাছের ধারে পুকুর পেছনে ফেলে দোলনায় দুলতো।

'শাড়িটা পরে নাও। আমি উঠবো।'

'আমায় ফেলে যেও না নীলকান্ত। আমি ফাঁকা বাড়িতে কোন-দিন একা থাকিনি। জীবনেও না।'

'বাঃ! এটা তোমার বাড়ি। এখানেই তো থাকবে তুমি। এখন কি আমরা পথে পথে, রেস্তোরাঁর পর্দার আড়ালে সব সময় যেতে পারি! না যেতে আছে?'

'না নীলকান্ত। এটা আমার বাড়ি নয়। বাসাবাড়ি, মাস গেলে একশো দশটাকা ভাড়া গুণে দিই। আমার কোন বাড়ি নেই, জায়গা নেই নীলকান্ত। বিশ্বাস কর—'

॥ ৫ ॥

'পোকা তোমার মাথায় রেখা। এত ভালবাসি তাও খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ছাখো কেন? আসলে তোমার কোন হ্যাংক্যাং নেই। সবই গ্র্যান্টেড্ বলে ধরে নিয়েছ।'

রেখা একজন স্বাস্থ্যবান যুবকের ওভারসাইজ ঘাড়ে পাউডার ডলে দিয়ে আরাম পাচ্ছিল। স্নানের পর খাটে বসে দাঁড়ানো বউকে আলতো করে বুকে নিতে এত সুখ। কাল বিকেলে নীলকান্ত খানিক-ক্ষণের জন্যে সরমার বুকের ওপর ছিল। কত সহজে পা দু'খানা মিলে দিল। সরমা বলছিল, 'এতদিন চাকরি করে এখন রোজকার খরচের জন্যে কারও আর হাতে-ধরা হয়ে থাকতে পারব না।' এখন বলতে ইচ্ছে হল নীলকান্তর, দেখে যাও হাতে ধরা হয়েও কত সুখ আছে। মেয়েদের স্বাধীনতা পুরনো হয়ে বাগ না মানা অব্দি ওরা স্বাভাবিক হবে না। মাস গেলে তিন চারশো টাকার স্বাধীনতার দাম কি!

বউকে বলল, 'আচ্ছা—আমি যে তোমায় এত 'ওগো' বলে ডাকি—কোথায়, তুমি তো আমায় একদিন ডাকলে না?'

'ও ডাকের মধ্যে আছেটা কি! আমি ওসব পারি না।'

'তবু তো একদিন একবার ডাকলে পারতে। আমি কি খুব শ্যাওলা পড়ে গেছি?'

'বাঙালরা বেশি বেশি ওগো হ্যাঁগো বলে ডাকে।'

রেখার মুখখানা এই মাত্র নীলকান্তর চোখে ভীষণ বিশ্রী হয়ে গেল। রেখাকে আর বউ মনেই হচ্ছে না। বেডফোর্ড লরির ভোঁতা নাক কিংবা বাঁধানো পঞ্জিকা—কোন ভাবই ফোটে না এমন কোন জিনিস।

নীলকান্ত জানে রেখা এত কিছু ভেবে কথাটা বলেনি। অন্য

সময় বাঙাল বললে এতটা গায়েও মাখে না। এই বাংলায় বাইশ বছর হয়ে গেল তার।

রেখা তার পাশে দাঁড়িয়ে সমানে খেটে এই সংসারে শ্রী এনেছে। বাইরের পৃথিবীতে গুলি, কারফু, মিছিল, ভোট, বেনাম জমি দখল হলেও নীলকান্তদের বাড়িতে সুরেন বিজয় গরমকালে ডাবের জল পায়, কচি নারকেল চারার গোড়ায় ঘরের ভাঙানো ধানের তুষ ছড়ানো হয়—আষাঢ়ের গোড়ায় নতুন জলে গুণে গুণে চারা মাছ ফেলা হয় পুকুরে গরু গরম থাকতে থাকতে ভেটারনারি সারজেন আইসবক্সে শিশি ভর্তি বীজ নিয়ে চলে আসে। এখানে সব সময় নিশ্চিন্তির, অবকাশের হাওয়া বয়। দেওয়াল ঘেরা ফুলবাগানে ঢাকা এই বাড়িটার ভেতর নীলকান্ত নাইনটিন থার্টিফাইভ মেইনটেন করে যাচ্ছে।

এসব সহজে হয়নি।

রেখা পাশে দাঁড়িয়েছিল।

অফিস থেকে বিদেশে চা চালান যায়। একবার কিছু মাল রিজেক্ট হয়ে ফিরে আসে। নীলকান্ত ধারধোর করে পুরো কনসাইনমেন্টাই ধরেছিল। ঠিক তখনই ধস নেমে নর্থ বেঙ্গলের রাস্তা ব্লক হয়ে গেল। দিন পনেরোতেই রাস্তা খুলে গেল ফের। কিন্তু সেই দু'হপ্তাতেই নীলকান্ত গুণতে পারে না—রাখতে পারে না—এত টাকা এসে গেল। ফলে ওরা দু'জনে আর কি করে। আন্দাজে ঘরবাড়ি পুকুর কেটে গোয়াল তুলে, গোলা বসিয়ে প্রাণপণে থার্টি-ফাইভ্ থার্টি-সিক্সকে ধরে রাখলো। দু'জনেই জানে এই দেওয়ালের বাইরেই একটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হয়ে গেছে। লোকজন, রাস্তাঘাট, বাজার দোকান সব অন্যরকম হয়ে আছে। অসাধারণ বলেই বাইরের কেউ এসে এই পলকা শান্তি সুখ তছনছ করে দিয়ে যাবে।

আসলে রেখা তার ছোটবেলার বাবার আমলের শান্তি ভুলতে পারেনি। ফিরে ফিরে তাই চায় বলেই নীলকান্তর পাশাপাশি মুখ বুজে রোদে পুড়েছে।

নীলকান্ত মায়ের যা যা স্বপ্ন ছিল—গোয়াল, পুকুর—প্রায় বঙ্কিমের সেই বিখ্যাত কোটেশন ধরে ধরে ভবিষ্যতের যে কোন বিপদের জন্যে আষ্টেপৃষ্ঠে তৈরি হয়েছিল। সামনের চোত্তমাসে একটা গরুও বিয়োবে, পোনা মাছগুলো এক কেজি সাড়ে বারোশোর সাইজ পাবে।

এই তো ক'দিন আগে রিক্শায় শেয়ালদা যাচ্ছিল। বৌবাজারে মোড় থেকে ট্রাম লাইন ধরে সিধে আকাশে উঠে গেলে একখানা হলদে গোল চাঁদের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো যেত সেদিন। নীচে ট্রাম বাস, লরির ছুটোছুটি একেবারে অলীক লাগছিল। ফুটপাতের পাশের পাইকারি বাজার ওপচানো কুমড়োর পাহাড়—আলোয় সব ভরে আছে।

এমন সময় একটা মেয়ের গলায় নীলকান্ত মুখ ঘোরালো। রাস্তায় এরা আজকাল খুব বেড়ে গেছে। নীলকান্তকে একটা দাঁড় করানো রিক্শা দেখিয়ে হাসতে হাসতেই ডাকছে, 'আকাশের চাঁদ পেড়ে নিয়ে যান বাবু—পেড়ে নিয়ে যান। কেউ কিছু বলবেন না।'

এমনও হয়! অবাক হয়ে গিয়েছিল নীলকান্ত। কলকাতা কি হয়ে গেল।

এই বাড়ির বাইরেই সারা পৃথিবী একেবারে তেতে পুড়ে আছে।

আগে হাতে একটাও পয়সা থাকতো না। মায়ের দেয়াদিকে নীলকান্ত রেখার লুকোনো সিকি আধুলি হাতাতো। একদিন ট্রাঙ্কের তলা থেকে এগারোটা টাকা চুরি করায় রেখা ঠোঁট কামড়ে তাকে দু' বার পর পর 'শয়তান' বলেছিল। তখন রেখা সৃষ্টিকার শ্বশুর নিত হাসপাতালে লাইন দিয়ে। বড়ছেলেটা ছোট, আজকের মত এত খারাপ রেখাকে সেদিনও লাগেনি।

'তোমার পিঠে এসব কিসের ফুলকুড়ি। দেখি দেখি—'

একটানে রেখাকে সরিয়ে দিল নীলকান্ত, 'কোল্ড্। সেলফিস—তুমি হার্টলেস রেখা' নীলকান্তর বউ কিন্তু তখনও হাসছে। ব্যাপারটা

বোঝেই নি। এরপর যে কি ঘটবে, নীলকান্তর আন্দাজেও তা ছিল না।

তার মুখ চোখ আস্তে আস্তে গম্ভীর হল।

নীলকান্ত বলল, 'তুমি সবকিছুই গ্রান্টেড বলে ধরে নিয়েছো। তোমার সুখ হলে তবে আমি ফুরোবো—তাও বাইরে—'

'লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি পুরুষ তাই করছে। নতুন কিছু নয়।'

'লক্ষ লক্ষ পুরুষ-মানুষ এখনো দশবারো বার বাবা হয়।' বলেই নীলকান্ত বুঝলো সকালের এমন হাল্কা রোদে এমন সব কথা বলতে নেই।

'হলেই পারো।'

'দু'বারেই প্রাণ নিয়ে টানাটানি। পেট কেটে তবে রক্ষে।'

'আরও নাহয় ক'বার কাটতো।'

'তা বলিনি। এখনকার মেয়েরা তো কতরকম কি খায়—পরে। —তুমি একদিনও খেয়েছো—পরেছো? সবটাই আমার ওপর দিয়ে যায় রেখা। বলতে পার—একদিন তুমি নিজে থেকে আমায় চুমু খেয়েছো?'

'আমি অত পারিনে—'

'পারোনা কেন বলো? ওপরে চেহারা যাই থাক—ভেতরে ভেতরে তুমি বুড়ি হয়ে যাচ্ছ। কোন বেগ নেই—আবেগ নেই। তোমার আমার—দু'জনের রোল আমি একা প্লে করি! আমাদের বয়সে তো কিছু আবেগ—কিছু পাগলামিই ন্যাচারাল। তুমি যে পুরোপুরি চরিত্ররক্ষণ সমিতির সভানেত্রী হয়ে আছ।'

'আমায় কি করতে হবে তাহলে?'

'এসব বলে হয় না রেখা। তর্ক করে, ঝগড়া করেও হয় না। নিজে না চাইলে কেউ সেই বেগ আনতে পারে না—ভালবাসা দিতে পারে না।'

'তুমি কি চাও আমার কাছ থেকে? আমি সরে যাব?'

'সে তোমার ইচ্ছে।'

'আর তুমি নতুন ঝি নিয়ে দিন কাটাবে! তাই না?'

'তা কেন? ওই ঝি দেখলে আমার বমি আসে। জল ঘেঁটে ঘেঁটে পা ভর্তি হাজা। দরকার হলে আজই কলকাতা থেকে ভাড়া করে টেমপোরারি বউ আনা যায়।'

'তারা বুঝি মিনিটে মিনিটে গলা জড়ায়—চুমু খায়! ওগো হ্যাগো করে!'

'ব্যাপারটা অত হালকা জিনিস নয়। ওই পথে ভালবাসা আসে। এসব উপদেশ দিয়ে হয় না রেখা।'

নীলকান্তর এখন বেরোনোর কোন দরকার ছিল না। ভেবেছিল সকাল সকাল খেয়েদেয়ে খানিক ঘুমিয়ে নেবে। তা আর হোল না। কামানো গাল, আঁচড়ানো চুল, পাট ভাঙা পাঞ্জাবি গায়ে নীলকান্ত বসু অনেক আগে অফিস পৌঁছে গেল। ফাঁকা হলঘর, ঠাণ্ডা ক্যালেণ্ডারের ফুলদানি সুদ্ধ একতোড়া গোলাপ অল্প হাওয়ায় দুলছে।

সকালবেলাই মন খারাপ হয়ে গেল।

আসলে ভালবাসা হয়েছে? হয়েছিল বিয়ের পরেই। রেখাকে চোখে হারাতো নীলকান্ত। তখনও মা বেঁচে। ছেলের ওপর দখল আলগা হতে দেখে কিছু রাগও করেছিল মা। একটা কথা ভেবে খুব কষ্ট হল নীলকান্তর। জগতে চেনা জানা লোকজন রোজই শট পড়ে যাচ্ছে। তারপর একদিন আসবে—যখন, উনিশশো তিরিশ কিংবা চল্লিশে যারা এই পৃথিবীকে জানতো—তাদের কেউই আর চেনা দিতে থাকবে না। নতুন লোকজন ততদিনে এই পৃথিবীকে চিনতে জানতে শুরু করে দিয়েছে।

আর একটা কথা মনে হল নীলকান্তর। বিয়ের পরে পরে নেটের মশারি চুইয়ে জ্যোৎস্না গিয়ে বিছানায় পড়ে থাকত। তখন আদুড় গায়ে রেখা ভগবানের উরু, ভগবানের নাভি, বুক, নিতম্ব নিয়ে এক একদিন মাঝরাতের আকাশের দিকে, অপার্থিব আলোর সবটুকু

মেখে ঘুমিয়ে থাকতো। কোমর থেকে একখানা পা হাঁটু অব্দি ভাঁজ হয়ে অনেকখানি মুক্ত হলুদ মাংস গভীর রাতের জ্যোৎস্নায় উপত্যকা হয়ে জেগে উঠতো। নরম, সেখানে কেউ কোনদিন পা ফেলেনি। দুই পাহাড়ের মাঝে অজানা তৃণভূমি। লোকালয় তার খবর রাখে না। রাতে শেষ একদিন স্বপ্ন দেখলাম, কে বা কারা সেই অবস্থায় রেখাকে পাঁজাকোলে নিয়ে যাচ্ছে। কি উদ্দেশ্য জানার উপায় নেই। ঘুম না ভাঙা অব্দি নীলকান্তর বুকের মধ্যে সে কি কষ্ট।

জীবন কেমন হয়ে যাচ্ছে। ছেলেটা হোস্টেলে। বেশির ভাগ দিন ক্লাসের পড়াই বোঝে না। বল্টু নীলকান্তর গলা জড়িয়ে ছুটির দিন দুপুরে ঘুমোতে ভালবাসে রেখা হয়ত মুখ গম্ভীর করে বসে আছে। সরমা এখন বাসস্টপে এসে দাঁড়িয়েছে। বাসের ভিড়ে পিঠেয় টোকা লাগতেই ব্লাউজের টেপা বোতামগুলো পটপট করে খুলে যাবে।

এর আগে এমন দোটানায় কখনো আর পড়েনি নীলকান্ত। আমি রেখাকে ছেড়ে থাকতে পারব না। সরমাকে ছাড়ি কি করে। এমন অবস্থা আগে জানা ছিল না তার।

ইন্ডিয়া আজকাল উগাণ্ডায় আমাশার ট্যাবলেট এক্সপোর্ট করে। ছানা তৈরির পাউডার যায় গিনিতে। চালানের নম্বর টুকতে টুকতে আড়াইটে বেজে গেল। শরীরটা খারাপ বলে নীলকান্ত বসু কলকাতার রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। ফাঁকা ট্রাম তাকে স্টুডেন্ট লাইফের কলেজের সামনে দিয়ে নিয়ে গেল। এখানে ফোর্থ ইয়ারে পড়ার সময় প্রিন্সিপ্যাল তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তাই তাকে অনেক কষ্টে বেশি বয়সে গোপনে অন্য এক কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হতে হয়। তখন বিশু মেডিক্যাল কলেজে চলে গেছে। সরমা কিছুদিন পরেই এই কলেজের সকালবেলার ক্লাসে ভর্তি হয়েছিল তিনমাসের মধ্যে সরমার তখন হাফডজন বয়ফ্রেণ্ড। অকৃতি নীলকান্ত সে সময় ফ্যাঁ ফ্যাঁ করে ঘুরে বেড়াত।

তড়াক করে হাজরার মোড়ে নেমে পড়ল। ট্যাক্সিতে বল্টুর হোস্টেল। স্কুলমাঠে বাঁধানো বেদি ঘিরে ছেলেরা খেলছিল। বাবাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এল। বিকেলে আরও অনেক বাবা আসে. কোন কোন বাবা-মাও এসেছে।

'সামনের শনিবার আসবে। তোমার হরলিকস্ ফুরোয়নি তো? বিস্কুট?'

'না। আমার জন্যে কি এনেছো বাবা?'

তাড়াতাড়িতে কিছুই আনেনি নীলকান্ত. 'চল বাইরে বেরিয়ে কিনে দেব। গেটপাস করে আনো. আমি দাঁড়িয়ে আছি।'

পথে বেরিয়ে ট্যাক্সি পাওয়া গেল না। কলকাতায় বাস কমে যাচ্ছে। এ রাস্তায় ট্রাম চলে না অগত্যা রিক্শা। বল্টুও তাই চায়। বাবার সঙ্গে বেশ কথা বলতে বলতে যাওয়া যায়।

'রাত পড়লে সুপারিনটেনডেণ্ট ঘুমিয়ে পড়ে। তখন আমরা এক বিছানায় তিনজন করে শুই।'

'খাট থেকে পড়ে যাবে।'

'জেগে থাকি।'

'শরীর খারাপ হবে।'

'জেগে থাকতেই হবে বাবা। ভীষণ গরম। ফ্যান নেই কোন। আমার খাট দেওয়ালের গায়ে।'

আরও একটা খবর দিল বল্টু, 'শৈবাল অসুখ করে বাড়ি গেছে। যাবার সময় ওর ভাগের ডিমটা ঠাকুরকে বলে গেছে আমায় দিতে। শৈবাল আমাকে খুব ভালবাসে বাবা।'

'আমি বাসি না?'

খুশিতে মাথা হেলিয়ে দিল বল্টু, 'তুমি তো বাসোই—'

'আর কে?'

'মা—'

'আর?'

'ছোটবোনও আমাকে খুব ভালোবাসে বাবা।'

তাহলে দাঁড়াল, বল্টুর চোখে—তাদের চারজনকে ধরে নীলকান্ত বসুর ফ্যামিলি ভালবাসা আমানতের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। নীলকান্ত নিজে এখন ভালবাসার ব্যাঙ্কার। ডবল ঘোড়ায় টানা আগেকার ব্রুহাম গাড়ি হলে মুখোমুখি সিটে রেখা এখন মেয়েটাকে নিয়ে বসতে পারত। ঘোড়ার দুলকি ছুটে নীলকান্তর বউ দুলে উঠে হেসে ফেলতে পারত। তাহলেই সারাদিনের গুমোট কেটে যেত।

'বাবা আমাকে ডেস্কালার করে দাও।'

'সেটা কি জিনিস?

'যারা বাড়ি থেকে পড়তে আসে তাদের ডেস্কালার বলে।'

'ওঃ! ডে-স্কলার।' নীলকান্ত ভেবে দেখল, এই স্কুলপাড়ায় এখন বাড়ি পায় কোথায়। রেখা কলকাতায় চলে এলে ওখানেই বা কে দেখাশুনো করবে। আমার মাথায় এত ঝক্কি—আর আমি বেহালায় চলে যাচ্ছি।

ছেলের মুখের দিকে তাকানো যায় না। মন খারাপ। মাথায় হাত রাখলে কি ভাববে। দু'জনে আইসক্রিম খেয়ে, বড় এক বাক্স বিস্কুট কিনে হোস্টেলে ফিরে গেল। বল্টু দোতলায় উঠে যাওয়ার সময় একবারও পেছনে তাকালো না।

নীলকান্ত সন্ধের ঝোঁকে দু'টাকা দিয়ে একটা মোটা গোড়ের মালা কিনে ট্রেনে উঠল। বাড়ি পৌঁছে একথা সেকথার পর একেবারে পরিণীতার শেখরের স্টাইলে দশ বছরের বিয়ে করা বউ রেখার গলায় মালাটা ঝপ করে ফেলে দিল। তখন বাগানের একটা কলাগাছের মাঝের পাতায় তেজী কোন পোকা ঢুকে পড়ে আর বেরোতে পারছিল না। তাই একটানা বোঁ বোঁ আওয়াজে সন্ধোটা ভরে গেল। লজ্জায়, সুখে রেখা একপাশে ঘাড় কাৎ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

'একদিন স্বপ্নে দেখলাম—তোমাকে কারা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে—'

'এখন খারাপ খারাপ কথা বোলো না। আমি কি খুকি!'

'আজকাল মনে হয় আমার তিনটি ছেলেমেয়ে। এক ছেলে দু'মেয়ে।'

'ইয়ার্কি রাখো। বল্টুর ওখানে গিয়েছিলে?'

'বিস্কুট ফুরিয়েছিল। দিয়ে এলাম।'

'অফিস যাওনি?'

'আগে বেরিয়েছিলাম—'

রেখা তবু তাকিয়ে আছে দেখে নীলকান্ত বলল, 'কেন গো।'

যে-ভাবে হঠাৎ বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামে, ঠিক তেমন করে নীলকান্ত রেখার ওপর পড়ে গেল।

॥ ৬ ॥

কিন্তু রাতে ফিরে সেই গোলমাল। এই কিছুকাল সন্ধ্যের পর তেমন কিছু আর করার থাকে না। রেডিও শেষ হতে ছাদে বসে নীলকান্ত আর রেখা অনেকক্ষণ সামনের ঝিলটার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর একসময় খুব আস্তে গেয়ে উঠল রেখা, 'আমার এ ধূপ না পোড়ালে-এ এ এ', গলা আকাশে উঠে গিয়ে থেমে থাকল। নীলকান্ত দেখল, আকাশে তাকিয়েই রেখা গাইছে 'গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে-এ এ এ।'

এরিয়াল টানানো খুঁটিতে সুরেন কখন এসে হেলান দিয়ে বসেছে। ইনসমনিয়ায় ভুগছে। দশ পারসেন্ট ডাইলিউশনের ব্রোমাইড মিকশ্চার খেত আগে। জ্যোৎস্না চোখে সয় না। একটা হাত কপালে রেখে চাঁদ আড়ালে করে নিল সুরেন।

নীচের গোয়ালে গরুটা লটপট করে কান নেড়ে মশা তাড়ালো। বল্টুর জন্য কষ্ট হচ্ছিল নীলকান্তর। সরমার জন্যও হচ্ছিল। ভগবান

কত কম আনন্দ দিয়ে লোকজন পৃথিবীতে পাঠায়। খুব বেশি আনন্দ বলতে কিছুক্ষণ জড়াজড়ি করে পড়ে থাকা। তারপর। সেখানেই শেষ।

মেয়েটা ঘুমিয়েছে অনেকক্ষণ। গণ্ডগোল শুরু হল মশারির ভেতর। নীলকান্ত ট্রেনে যেতে যেতে একটা ছবিওলা গরম মাসিক কাগজে দেখেছিল, কতভাবে কত কাছাকাছি হওয়া যায়। তারই একভাব করতে গিয়ে রেখা বিগড়ে গেল।

'অসুবিধে হচ্ছে।'

'দুনিয়া সুদ্ধ লোকের তো হয় না।'

রেখা রাগে রাগে বারন্দায় চলে গেল। পেছন পেছন গিয়ে নীলকান্ত দাঁড়াল। আলগা করে ঘাড়ে হাত রাখতেই রেখা এক ঝটকায় সরিয়ে দিল।

'কি আশ্চর্য! আমার নিজের বউয়ের গায়ে হাত রাখব না? আবদার তো বেশ—'

'সব সময় ভাল লাগে না। সময় অসময় নেই?'

এর চেয়ে নীলকান্তর নাকে কেউ সেধে ঘুষি মারলে কম লাগতো। সময়টা অদ্ভুত। লাস্ট ট্রেন চলে যাওয়ার পর মালগাড়ি সান্টিং হচ্ছে। একবার ইচ্ছে হল বলে, রেখা তোমার কাছে এসবের মাহেন্দ্রগণ বোধ হয় লিপইয়ারের ফেব্রুয়ারি-সংক্রান্তি। ততদিনে আমি বুড়ো হয়ে যাব।

'একদিন তোমায় আজকের দাম দিতে হবে রেখা। সেদিন তুমি মুখিয়ে উঠলেও সবকিছু এমন থাকবে না।'

রেখা শুধু মুখ তুলে তাকালো। অনেক সময় চাঁদের মাঝখান দিয়ে আকাশের এপার ওপার জুড়ে মেঘের লাইন পড়ে। রেখার বাঁ চোখ চিরে একটা শিরা অমন চলে গেছে। তাকানোতে ব্যথা ছিল। নীলকান্ত আর কিছু বলতে পারল না।

'আমার গা গুলোয়। বমি আসে। শুধু এজন্যে তো আমরা

নই।' কথাটা বলে রেখা তাকিয়ে থাকল। তারপরে নীলকান্ত আর কিছু বলতে পারল না। অনেকদিন বিয়ে হয়ে গেলে মানুষ কিসে আনন্দ পায়? একথা কে বলে দিতে পারে।

একটু পরেই রেখা নিজে এসে নীলকান্তর পিঠে হাত রাখলো, 'তোমার মন খারাপ কেন?' তারপর মুখ টিপে হেসে বলল, 'শুধু এসব চিন্তা করলে মন ক্লান্ত হয়।'

'তুমি আমার বউ না গুরুঠাকুর?'

'কেন

'আমাদের যা বয়েস—তাতে এসবই ন্যাচারাল। বন্ধ রাখাটাই আনহেলদি। আমার তো ক্লান্ত হয়ে না ঘুমোলে পুরো ঘুমই হয় না। ভোরে মনে হয়—কি বাদ গেছে—কি বাকি ছিল।'

'বাদ থাকছে কোথায়?'

'একেই বাদ বলে।'

এখানেও সুরেন। নীলকান্ত চটে গেল। ঘরের ছেলের মত আছে। তাই কিছু বলতে মায়া লাগে। কিন্তু, এখন এখানে। নীলকান্ত তাড়া লাগালো।

'বকছো কেন। আহা! ক্ষিধে পেয়েছে বোধহয়।'

রেখার সঙ্গে প্রায় মাঝরাতে কলা নিতে গেল সুরেন। বিজয় রাত দশটা বাজলেই ঘুমিয়ে পড়ে। নীলকান্ত দেখল, তাঁর চারিদিকে সংসারের জাল অনেক দূর ছড়িয়ে পড়েছে। তারই গজানো এত শেকড় একদিনে কেটে ফেলা যাবে না। এজন্যেই বোধহয় মৃত্যু আছে। সবচেয়ে বড় অপারেশন।

সরমার মা নিশ্চয় তারকেশ্বর থেকে ফিরেছে। ঘরে ঢুকে বুঝতে পারবে না, তাঁর ফুলদানির গোলাপ তোড়া মেঝেতে পড়ে ফুলে ফুলে কেঁদেছে। তখন সোফায় বসে ছিল, বিপন্নপালক বসুর ছেলে নীলকান্ত বসু। বিশুর বন্ধু নীলু।

সাপ না বাঘ—নিজের ছানা খেয়ে ফেলে। অনন্ত মিত্তিরের রোগা-

ভোগা বউ তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে। অবশ্য ওপর ওপর সবসময়েই একটা স্নেহের মোড়ক থাকে। যার চলতি নাম ভালবাসা।

এতদিন পরে নীলকান্ত পরিষ্কার দেখতে পেল, আমরা পৃথিবীতে আছি ভালবাসাবাসির জন্যেই। আমাদের আত্মা বা সোল কোন রঙের তা জানি না। লেবুর আচারের ধাঁচে আত্মাকে বয়সের মশলা-তেলে ডুবিয়ে রাখলেও ভেসে উঠবে না। অথচ সবসময় আমরা একজন আরেকজনের ওই জিনিসটা ছুঁতে চাইছি, হাত দিয়ে ধরে দেখতে চাই। হয় না বলেই যতটা কাছে যাওয়া যায়—এই ভেবে আমরা বুকে বুক লাগাই, পারলে পিষে ফেলে আত্মার খোসা একেবারে ভেঙে ফেলতে চাই। এরও নাম ভালবাসা। আরেক রকমের।

বেলা দশটা দশ। সরমার অফিসে লিফ্‌টম্যান নীলকান্তকে দেখে ঠোঁটের কোণে হাসলো, 'এইতো দিদিমণি এল।'

লোহার খাঁচাটা ওপরে উঠছিল। আয়নায় নীলকান্ত দেখল, তার ঘাড়ের একদিকে খানিক লালচে ছোপ ধরেছে।

রিসেপসন কাউন্টারে সরমা খুব মনোহারী ভঙ্গীতে কোন হোমরা চোমরা অফিসারের সঙ্গে গম্ভীরমুখে কি কথা বলছে। বনেদী ভিজিটর সেজে নীলকান্ত চুপ করে সোফায় বসে থাকল। লোকটা চলে যেতেই সরমা ছুটে এল, 'তুমি যখন লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে রিসেপসন হলে ঢুকছিলে—একেবারে হিরো হিরো লাগছিল।'

'বাঃ! আমি তো একশোবার হিরো!'

'নিজের চেহারার জন্যে খুব গর্ব—'

'মোটেই না। খাঁটি হিরো কিরকম হবে? চারিদিকের চাপে সে পিষে যাবে। তবু চিঁ চিঁ করবে না। দোটানায় জ্বলে পুড়ে যাবে তবু অচঞ্চল।'

'তোমার গলায় ওগুলো কি?'

'এইমাত্র লিফ্‌টের আয়নায় দেখলাম। কিছু ইরাপসন হবে—'

'আগে বেরিয়েছে কোনদিন?'

'নাঃ! ক'দিন আগে পরেও কি দেখছিলাম। তোমার বৌদি বলল—পিঠে কি বেরিয়েছে। কেন? কোন টোটকা জানা আছে?'

সরমা বিড়বিড় করে কি বলে গেল।

'আমি আজ অফিস যাচ্ছি নে। তোমাকেও আজ ছুটি নিতে হবে সরমা—'

বেয়ারাকে কফি আনার পয়সা দিয়ে নীলকান্তর দিকে তাকালো, 'কেন বলতো?'

'শুনলে তুমি হাসবে। কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটা সিরিয়াস। তখন আমাকে ফিরিয়ে না-দিলে সেই বয়সে সেই দিনে যেসব জায়গায় আমরা যেতাম—আজ সেখানে দু'জনে যাব।'

'যেমন?'

'ভিক্টোরিয়া, স্ট্রাণ্ড, বটানিকস, চিড়িয়াখানা—'

'কলকাতা দর্শনে!'

'আত্মদর্শনও বলতে পার।'

'ছুটি নিচ্ছি। কিন্তু একদিনে সব পারবে! এত জায়গা—'

'আমরা যে সে সময়ে চলে যাব সরমা। সেই সুখের সময়ে। তখন বেহালার সুরকি-রাস্তার দু'ধার দিয়েও কিছু না-হোক ভোরবেলা শেয়ালকাঁটার হলদে ফুল জেগে উঠতো।'

কফি এলে সরমা বলল, 'তুমি গিয়ে কফি হাউস ছাড়িয়ে পেট্রল পাম্পের ওখানে দাঁড়াও। মিনিট পনেরোর মধ্যে যাব।'

প্লেটে ঢেলে ঢেলে নীলকান্ত কফি শেষ করে ওঠার সময় বলল, 'বেরোনোর সময় খোঁপা খুলে ফেলে তখনকার মোটাসোটা একবেণী বেঁধে নেবে কিন্তু।'

'আর কি কি ফরমায়েশ আছে শুনি। মাথায় কি এখন অত চুল থাকে।' তারপর নিজে নিজেই বলল, 'আমার যদি কিছু না হোত—'

নীলকান্তর তর সইছিল না। হলঘর থেকেই হাত তুলে ফিরতি

লিফট্ নামালো। পাপোশের পাশেই স্ট্যাণ্ডে লেখা আছে প্লিজ ওয়াক ডাউন। আজ সে সব কিছু পড়লো না। সে এখন সাক্ষাৎ হিরো।

পনের মিনিটের জায়গায় আধঘণ্টা। সরমা এল। দেরি দেখে খুব রাগ হয়েছিল নীলকান্তর। কাছে আসতে তা পড়ে গেল। সরমাকে দেখে একদম জল হয়ে গেল নীলকান্ত। একবেণী বেঁধে সরমার মুখ চেনাই যাচ্ছে না। তারপর মুখের পাউডার, ঠোঁটের ফিকে লাল আভা, চোখের কাজল—সবই ঘষে ঘষে ধুয়েছে।

'ব্লাউজ ভিজিয়ে ফেলেছো দেখছি।'

'ঘুরতে ঘুরতে রোদেই শুকিয়ে যাবে। কেমন দেখাচ্ছে গো—'

'সুপার্ব।'

'সত্যি। তোমার ভাল লাগছে?'

'খুব।'

হাঁটতে হাঁটতে সরমা বলল, 'আমি আগে এরকম ছিলাম।'

নীলকান্ত চলতে চলতে সরমাকে দেখছিল। কি যেন নেই মুখে। মাড়ির দাঁত তুললে এমন হারাই হারাই ভাব চোখে ফুটে ওঠে। ট্রাম লাইনে ফুল হয় না। দু'পাটির মাঝখান দিয়ে ঘাসের গদি হয়ে আছে। তাতে স্টপে স্টপে তেল মবিলের দাগ। ট্রাম দাঁড়ালে বোধহয় কিছু বেরোয়।

লোকজনের মধ্যে সরমা ওর হাত চেপে ধরল, 'এই ঘেমো জামা গায় দিয়ে আমি তোমায় যেতে দেব না। চল একটা রেডিমেড্ পাঞ্জাবি কিনবে।'

এমন জোর করলে কত ফাইন লাগে। সরমা কিছুই গ্রাণ্টেড্ বলে ধরে নেয়নি। রেডিমেডের দোকানে ঢুকে ফিনফিনে আদ্দির একটা পাঞ্জাবি চড়ালো গায়ে। খুব বড়লোকের মত একতাড়া নোট ইনসাইড পকেটে অবহেলায় গুঁজে নিল নীলকান্ত। পথে নেমে নীলকান্ত চেপে ধরল সরমাকে, 'তোমাকে কিছু কিনতেই হবে আজ—'

'সিওর।'

'হানড্রেড্ পারসেন্ট।'

'চল তবে।'

নিউ মার্কেটে ঢুকে একটা তিন পকেটের হাতব্যাগ ভীষণ পছন্দ সরমার। সেটা কেনার পর পাশেরই একটা দোকানে টেনে নিয়ে গেল নীলকান্তকে, 'এখানে ফাস্ট কলার পাওয়া যায় বুঝলে। তুলিও এখান থেকেই কিনি। তারপর বাড়িতে বসে শাড়িতে ডিজাইন তুলে এঁকে ফেলি—'

খুব সাশ্রয় হয় এমন একটা হিসেবী ভঙ্গী করে কথা বলছিল সরমা।

নীলকান্ত কোন চান্স না দিয়ে তিন তিনটে আলাদা সেটের টিউব কিনে ফেলল, আর একটা তুলিও।

মার্কেটের আলোয় আলো গলি। সরমা খুব কৃতজ্ঞ হয়ে পড়ল, 'আমাকে কেউ কোনদিন কিছু দেয়নি নীলকান্ত।'

'নাওনি তুমি।'

তারপর মেয়েদের যা প্রায়ই কেনার ইচ্ছে হয়— মন একটা দোকানে ঢুকে পড়ল নীলকান্ত। বুকটাকে ঢেউ করে কুমারী করে দেবে—একেবারে আনকোরা—সে জিনিসের দাম সাত টাকা থেকে বাইশ পর্যন্ত। সরমা মাপ বলতেই নীলকান্ত ফস করে দামি একজোড়া কিনে ফেলল। সরমা দাঁড়াতে পারছিল না। কিছু ভর হলে, আবেগ এলে লোকে যেমন দাঁড়াতে গিয়ে দাঁড়াতে পারে না—হাতের কাছে যা পায় তাতে ভর দেয়—সরমাও তেমনি দুই কনুই কাউন্টারে চেপে ধরে নিজের হাতের তালুতে মুখখানা রেখেছে। আনন্দে ঠোঁটের একদিক প্রায়ই ফাঁক হয়ে যাচ্ছিল।

কি খেয়াল হল, পাজামা দর করে বসল। ফুল আঁকা পাজামা আর ঢোলা শার্ট সামনে ফেলে দিয়ে দোকানী বিতিকিচ্ছিরি দাম

বলতে লাগলো। রেখা আট ন' টাকায় এমন পাজামা অর্ডার দিয়ে বানিয়ে দেয়। দর করে মহা বিপদ।

'ভেবেছিলাম, সকালে সবজির চাষ দেখার সময় পাজামা পরে ক্ষেতে নামব। ধুতি বড় নষ্ট হয়।'

সরমা আরও উৎসাহিত হয়ে পড়ল, 'কোন দরকার নেই'—দোকানীকে বলে ফেলল, 'অনেক জমিতে চাষ হয়।'

দোকানদার সুতোর কাজ করা ভীষণ দামী একখানা পাজামা সুট বের করল। নীলকান্ত লজ্জায় মিশে যাচ্ছিল। কোথায় দাঁড়িয়ে জমির কথা বলছে।

আর একটুও দাঁড়াতে না দিয়ে নীলকান্ত সরমার হাত ধরে টানতে টানতে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল, 'ট্যাক্সি। ট্যাক্সি—'

হাওড়ায় নানা রকম ঝাঁকুনি খেতে খেতে ওরা বটানিকসে এসে থামল। ট্যাকসি থেকে নামার সময় নীলকান্ত বলল, 'মনে রাখবে এখন আমার পঁচিশ, তোমার উনিশ কুড়ি।'

শুধু এই কথাতেই সরমা এত টাটকা হয়ে গেল। একটু আগেও মনে হচ্ছিল, মুখের বাইরে কিংবা ভেতরে কি নেই। বাগানের বাইরে ভারত সরকারের সাইনবোর্ড। তাতে ইংরাজি, বাংলা, হিন্দি, অনেক কথা লেখা। এমন সাইনবোর্ডে সবসময় পাওয়া যায়—সেই বাংলা কথাটাও ছিল—অনুমত্যানুসারে। গেট দিয়ে ভেতরে ঢোকার মুখে সরমা ঝকঝক করে বলল, 'একযুগ পেছনে চলে যাচ্ছি!'

তার চেয়েও অনেক পুরনো গাছ চারিদিকেই দাঁড়ানো। এখন আশ্বিনের মাঝামাঝি। নীলকান্ত মনে করতে পারলো না—আর ঠিক ক'দিন পরেই পুজো। তবে বাতাস শুঁকলেই বোঝা যায়। আসছে।

নীলকান্তর কাঁধে, পিঠে যতটা পারে মাথা ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে হাঁটছিল সরমা। হঠাৎ নীলকান্ত চব্বিশ পঁচিশের পোজে দাঁড়িয়ে পড়ে সিগারেট ধরালো। ফস করে সরমা বলে বসল, 'হচ্ছে না, একদম আসছে না—'

মুখখানা নিরুপায় হয়ে গেল ওর।

সরমা যে-গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে এসব কথা বলল, তার গায়ে টিনের পাতে গাছটার নামও লেখা ছিল।

'কি আসছে না?'

'নাইনটিন ফিফটি থ্রি—ফিফটি ফোর। মনেই পড়ছে না একদম।'

অনেক বাকি থাকতে নীলকান্ত সিগারেটটা ফেলে দিল। যে জন্যে আমরা ছুটে যাই, যার নাম আমাদের মনে একটা সময়ের চেহারা নিয়ে পড়ে থাকে—পুরনো দিন ফিরে পেতে সেখানে গিয়ে আমাদের ভেতরটা শুধু হা হা করে ওঠে। নেই। তা কোথাও নেই। নীলকান্ত এসব জানতো খানিক। তার তো প্রায়ই এমন হয়।

বাগানের ভেতরটা বেলা বারোটা না বাজতেই একটু অন্ধকার হয়ে এল। এবারে মেঘ যাতায়াত করছে। দূরে একদিকে শুধু আলোর আভা। গাছপালা ফুঁড়ে তা এদিকে এসে পড়ছে। সেখানে গঙ্গা।

কিছু ভাবতে না দিয়ে সরমার হাতখানা ধরে নীলকান্ত আলোর দিকে জোরে হাঁটতে লাগল। এক জায়গায় ওদের হাঁটু সমান ঘাস। সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে খুব মনোযোগ দিয়ে নীলকান্ত সরমাকে চুমু খেল। এরকম মন দিয়েই ও ডাকবাক্সে চিঠি ফেলে। সরমা জল বা দুধ খাচ্ছে এইভাবে অনেকক্ষণ ধরে নীলকান্ত-চুম্বন পান করলো।

'আমরা কলেজ লাইফে সরমা একবার এখানে পিকনিকে এসেছিলাম। তখন কত মোটা মোটা কাঠ গঙ্গার ভেতর অনেকদূর ভাসানো থাকতো।'

দেখতে দেখতে আন্দাজে সে-জায়গাতেই এসে পড়ল ওরা। শীতের আগাম ঠাণ্ডায় চারিদিকের হাওয়া ফিনফিনে হয়ে আছে। শুধু আলো, ভয়ঙ্কর আলো, সলিড লাইট। নৌকোর পাল বাতাসে ফুলে যাচ্ছে। আর পায়ের সামনে থেকে বিপুল, বিশাল সব গাছের গোল গোল গা মাটি ছাড়িয়ে গঙ্গায় পড়েই ভাসতে ভাসতে অনেকটা গিয়ে থেমে আছে। একটা দিক লোহার শেকলে আটকানো।

দুজনে টপকে টপকে নদীর ওপর ভাসন্ত একটা গাছের ওপর গিয়ে দাঁড়াল। আলো, হাওয়া, ঢেউ সব কিছুই এখানে জোরালো। সরমার একবেণীটা মাঝে মাঝেই বাতাসের ধাক্কায়, সরমার খুশির নড়াচড়ায় জায়গা বদলাচ্ছে। সামনেই বটানিকসের দেড় দু'শো বছরের গাছগুলো ডালপালা মেলে দিয়ে পুরনো অভ্যেস আলো দিচ্ছিল, হাওয়ায় দুলেও যাচ্ছিল। শহরের কাছে একেবারে নদীর সামনে একটা ভয়ানক প্রাকৃতিক কাণ্ড।

সরমা বলল, 'গাছটা আমাদের ফেলে দেবে না তো। দেখ কেমন দুলছে।'

'এরকমই দোলে। বান এলে বানের সঙ্গে সঙ্গে ঠেলে ওঠে।'

বাঁদিকেই আন্দামান নিকোবর সরকারের অফিস। এইসব কাঠ ওদেরই। খদ্দের ধরতে সমুদ্র পার করে এখানে এনেছে।

একটা গাছের গা দিয়ে ধোঁয়া উঠছিল। সরমা বলল, 'আগুন।' অতগুলো কাঠের ভেতর এতক্ষণ একজন লোক উবু হয়ে বসেছিল। চোখেই পড়েনি। প্যান্ট শার্ট ছালতোলা গাছের রঙের, 'দাউদাউ করে জ্বলবে না কখনো।'

সরমা তাকিয়ে আছে দেখে বলল, 'সব সময় গঙ্গা রয়েছে নীচে।'

'নিভিয়ে ফেলে না কেন?'

'একবার ধরে গেলে আর নেভানো যায় না। ভেতর থেকে ধরে ওঠে।'

'এখানে আগুন লাগলো কি করে?'

'মাঝিরা কেউ রান্না করছিল ওর ওপর বসে। যাবার সময় উনুন উপুড় করে রেখে গিয়েছিল হয়ত।'

'কবে?'

'দশ বারো বছর তো হবেই। ফিফটি থি-ফিফটি ফোরও হতে পারে। আরও বিশ পঁচিশ বছর জ্বলবে। গঙ্গা নিচেই আছে বলে এতদিন ধরে জ্বলে।'

আলাদা একটা সোঁ সোঁ আওয়াজ হচ্ছে।

লোকটার আসবার কোন লক্ষণ নেই। ধার দিয়ে একটা নৌকো যাচ্ছিল। নীলকান্ত হাত তুলে থামাল। সরমার হাতে নতুন ব্যাগ—তাতে তিন টিউব রঙ্, টিফিনের কৌটো, ফাস্ট কলার রাঙানোর ব্রাস, প্যাকেট মোড়া নীলকান্তর ছাড়া জামা। টাল সামলে দু'জনে ছইয়ের ভেতর গেল। মাঝি টেগু। বড় একটা গামছা গলুই বরাবর টানিয়ে দিল।

'বড় তাত রোদে। ঘুম পড়ি থাকেন। হাওয়া হাওয়ায় ঘুরো আনি—'

নীলকান্ত সরমার কোলে মাথা দিয়ে ওর গলায় নিজের হাত দু'খানা আঙটা করে মাথাটা কাছে টানলো। অনেককাল আগে শুনেছিল, যাকে ভালবাসা যায়—ঠোঁটে ঠোঁট লাগালে তার মুখ সুগন্ধি মনে হবে। তাই তো মনে হচ্ছে এখন তার। তবে কি আমি সরমাকে ফিরে ভালবাসলাম? পরীক্ষা করে দেখতে নীলকান্ত আবার চুমু খেতে গেল।

'না। এই তো বেশ শুয়ে আছো। ঘুমিয়ে পড়। মনে কর তুমি এখন পঁচিশ। আমি কুড়ি একুশ। বাবা বেঁচে। ছোড়দা এম বি পড়ছে—'

'আমি কিছুতেই ঘুমোবো না। মুখটা আনো—'

'না। তোমার গলায় ও দাগগুলো কবেকার?'

'হপ্তাখানেক বেরিয়েছে। কেন সরমা?'

'কিছু না।' তারপর খুব আস্তে বলল, 'আমি খুব সেলফিসের মত তোমাকে খারাপ করে দিচ্ছি।'

'আমার আবার খারাপ হবার কি আছে! সরমা, আমার তো কোন ফিউচার নেই। প্রেজেন্ট Nill. আমি শুধু আছি—শুধুই আছি। কোন দিক নেই—দিকই চিনিনা। চিনলেও এগোতাম না। আমি একটা জীবন কাটাচ্ছি—শুধুই কাটাচ্ছি। আমি শুধু সবার সঙ্গে আছি—সবার রুমমেট শুধু।'

কথা বলতে বলতে নীলকান্ত উঠে বসল। সরমা ওর বুকে হাত রাখল, এখন কথা বলছ কেন? তোমার তো সামনেই বিরাট ওয়ার্ল্ড। বরং বলতে পার গত কয়েকদিন আমি তোমার গ্লোরি ধার করে বেঁচে আছি।'

গঙ্গার ওপারে পাটকল কিংবা অন্য কোন কারখানা টিফিনের ভোঁ দিল দূরে তীর ঘেঁষে তিনখানা খড়ের নৌকো চলছে। নিঃসঙ্গ দু'একটি কচুরিপানা ভেসে আসছিল। এখন এখানে দুপুর বোঝা যায় না, সকাল বোঝা যায় না।

হঠাৎ সরমা বলল, 'নীলকান্ত একটা কথা বলি তোমায়। তুমি বোধহয় ফিরে ভালবাসছো আমাকে। তাই না!'

'হুঁ। তাতে অসুবিধে আছে কোন?

'না। একদম না।' বলতে বলতে নীলকান্তর নতুন পাঞ্জাবির বুকপকেটের ওপর জলসুদ্ধ চোখ, নাক, মুখ চেপে ধরল, 'আমি আর উনিশ নেই নীলকান্ত—আমি আর ভাল নেই নীলকান্ত। মা জানে না—পোকায় ভর্তি গোলাপতোড়া পাহারা দিচ্ছে দিনরাত।'

ওর মাথায় চিবুক চেপে খুব আস্তে নীলকান্ত বলল, 'তাতে কি সরমা' আমরা সবাই তো সেলফিস। আমিও আর পাঁচশ নেই সরমা। তোমাকে পাওয়ার একটা ফলস্ সুখে নতুন করে ডুবতে চাই বলেই তো এসব। তুমি কেমন—তুমি কতটা—তুমি কতদূর—একবার তোমাকে ভেঙে খুলে ফেলে পাট বাই পার্ট দেখতে চাই বলেই তো এসব। আমিও কি আর ভালো আছি সরমা।'

'আড ইয়ারে অফিসে ঢুকেছিলাম। আমার মত ঢিলেঢালা একটা মেয়ে কতদূর কি করতে পারে বেকার ভাইদের চাকরিতে বসাতে কম কষ্ট করিনি।'

'আন্দাজ করেছি।'

'কম দাম দিইনি। বাজারে কেউ কাউকে মায়া করে না। রেহাই দেয় না নীলকান্ত।'

'একবার পুজোর সময় তোমাকে নবমীর রাতে হাজরার মোড়ে একজন লোকের সঙ্গে দেখেছিলাম। খুব কথা বলতে বলতে হেঁটে যাচ্ছ। অফিসের লোক মনে হয়েছিল।'

'কত নবমী দশমী, একাদশী-দ্বাদশী গেল! কত কথা বললাম—কম হাঁটিনি কলকাতার ফুটপাত ধরে ধরে—'

'তোমার জন্য কষ্ট হয় আমার।'

'তখন ছিলে কোথায়?' তার পরেই নিভে গিয়ে সরমা বলল, 'তোমার গলার ওসব দাগ আমার নীলকান্ত। পিঠেও বেরিয়ে থাকলে—আমারই। তোমাকে না বলে পারব না। তুমি আমায় ভালবাস নীলকান্ত!' চোখে এবারও জল এসে থাকবে। উনিশ বছরের সরমা আঁচলে মুছে নিল। অনন্ত মিত্তির বোধ হয় বেঁচে আছে। 'আমার ট্রিটমেন্ট ঠিক মত হয়নি নীলকান্ত।'

কি বলছ সরমা?'

'ঠিকই বলছি। তখন যে যা বলেছে—তাতেই রাজি হয়েছি। আমার কোন উপায় ছিল না নীলকান্ত। বিজন কম্পার্টমেন্টাল পেল। আমি তো জানি চাকরির বাজার কিরকম। উঠে পড়ে লেগে গেলাম। তখন দেখি, অফিস সুদ্ধ লোক আমায় সাহায্য করতে চায়। কারটা নেব—কারটা নেব না—তাই এক সমস্যা। একি তুমি কাঁদছ কেন নীলকান্ত। আমায় কিছু বল—আমি তোমার শরীরে রোগ দিলাম—'

সরমা ততক্ষণে নীলকান্তকে বুক বরাবর জড়িয়ে ফেলেছে, 'আমিই তোমাকে নষ্ট করলাম নীলকান্ত।'

'আমি বড় সেলফিস সরমা। তোমার জন্যে দারুণ কষ্ট হচ্ছে। কেন সেদিন তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়নি। কেন অভিমান করে দূরে দূরে ছিলাম!'

তখনও সরমার বুক ফুলে ফুলে উঠেছিল কান্নায়। নীলকান্ত নিজেকে ছাড়িয়ে নিল না। খটাং করে নৌকা এসে ঘাটে লাগল।

আবার সামনে সেই গাছগুলো। কারও বাকলে ক্ষয়ের গুটি দেখা দিলে সরকারী লোক এসে স্যাম্পেল নিয়ে যাবে। মাসে মাসে টিটমেন্ট হয়। কারও গুঁড়িতে গোখরো বাসা বাঁধলে স্টিরাপ পাম্প দিয়ে দূর থেকে গর্ত বরাবর তোড়ে নাইট্রিক অ্যাসিড ছেটান হয়। সবই শোনা কথা। পিকনিকে এসে কে বলেছিল।

আগে নেমে গেল সরমা। নেমেই ছুট।

মাঝির খুচরো ছিল না। পাঁচ টাকার নোটটাই গেল। বাঁধানো সরকারী ঘাটের ধাপগুলো তরতর করে বেয়ে নীলকান্ত ওপরে উঠে এল। একপাশে আন্দামান সরকারের পেন্সিলের লাটের মত লম্বা লম্বা কাঠের স্লাট। সেই লোকটা তখনও বসে।

'আজকে বুকের বাগানে জ্বলবে আলো'···গানটা নীলকান্ত কবি দীপক মজুমদারের নাটকে শুনেছিল। কি তখন নাম ছিল নাটকের। সে কবি গেল কোথায়। আর লেখে না।

মেঘে চুবানো রোদ্দুর নীলকান্তর চোখের সামনে সারা তল্লাট ফিল্টারের আড়ালে নরম করে তুলে ধরল। এখন সরমা গেল কোথায়। কোথায়? আজ কি বাগানে শুধু আমরাই। আর কেউ আসেনি। দূরে কোন গাছের আড়াল থেকে বাজনা বোঝাই গানের কলি ভেসে আসছিল। খালি গলায় আজ কে গাবে। আজকে বুকের বাগানে জ্বলবে আলো··। বাগানে আজ আর কেউ আসেনি।

'সরমা।' নানান জাতের শ্যাওলার আটচালায় এক সেকেণ্ডের জন্যে নীলকান্ত সেই একবেণীটা দেখতে পেল। লম্বা টিনের শেড। পাশে আলো ছেঁকে নেওয়ার জন্যে কাচের দেওয়াল। নীচে দেশ-বিদেশের শ্যাওলা। লোহার জালের পাহারা। টুকরো টুকরো টিনে লাটিন নাম আর স্যাকন—সব লেখা। ভেতরটা ঠাণ্ডা, অন্ধকার বলে পিকনিক পার্টির লোকজন ফাঁক পেলেই ওখানে জড়াতে যায়. চুমু খায়।

গাছের আড়ালে নতুন রেকর্ড বাজল।

'সখি দিবসরজনী ভালবাসা, ভালবাসা-আ-আ। ভালবাসা কারে কয়—'

'সরমা।'

'লাগছে। ছাড়ো।'

নীলকান্ত একবেণীটাই ধরে ফেলেছে, 'পালাচ্ছ কোথায়?'

'ছাড়ো। আমি আর পারি না। আমাকে দিয়ে আর কিছু হবে না।

বিরাট টিনশেডের নীচে তখন আর কেউ ছিল না। দু'ধারে নানান দেশের শ্যাওলা। চৌবাচ্চার ঠাণ্ডা সবুজ জলে ভেসে ভেসে আছে। কাচের দেওয়ালে বাইরের বড় বড় গাছের পাতার ছায়া ঘুরে ঘুরে পড়ছে। নীলকান্ত আর একবার নিজের ঠোঁট সরমার ঠোঁটে বসিয়ে একজন মানুষের বুকে অনেক সুধা থাকতে পারে ভেবে চুমুক দিল।

জেনেশুনে কি করছ নীলকান্ত।' সরমা নিজেকে প্রায় ছাড়িয়ে ফেলেছিল।

ফিরে টেনে নিল নীলকান্ত। ফিরে ভাল করে বাটি উলটে চুমুক দিল। সরমা কিছু বুঝে উঠতে পারেনি। পুরুষলোক অনেক সময় ঘোরের মাথায় দিগ্বিদিক হারিয়ে এমন করে তা সে জানে। বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই। পরে পস্তায়।

ছুটির দিনে ঠিক এই তৃপ্তিতেই দুপুরে ঘুমিয়ে নীলকান্ত চায়ের কাপে মুখ দিতে দিতে কথা বলে 'তুমি উনিশ। আমি পঁচিশ। আজ আমরা এখান থেকে একসঙ্গে ডাক্তারখানায় যাব।

'আমার গিয়ে লাভ নেই। দেরি হয়ে গেছে। তুমি যাও।'

'কখনো কারও দেরি হয় না সরমা।'

এতক্ষণ মরে ছিল সরমা। এবার নীলকান্তর পাশাপাশি লম্বা লম্বা পা ফেলে সামনে এগোতে গেল। তার একটা হাত নীলকান্ত

ধরে নিল। একেবারে শেষের চৌবাচ্চায় ভারিসুন্দর একটা শ্যাওলার ঝাড়। টিনে নাম লেখা—অ্যারিগোপিটিনিয়া সিলভাসিয়াম।' ইংরাজিতে জন্মস্থানও লেখা আছে। সরমা চিনতে পারল। ভূগোল পড়েছে। চিরহরিৎ বনক্ষেত্র।

শেষ ॥